

ଅଂସ୍ଥା, ୧-୪

ସାହିତ୍ୟ-ପରିଷଦ-ପତ୍ରିକା

ସମ୍ପାଦନା ଓ ଭାଗ

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

ପତ୍ରିକାଧ୍ୟକ୍ଷ

ଶ୍ରୀନିମେଶଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ



୧୩୫୭ ବର୍ଷ

‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’ ৫৭শ ভাগের

প্রবন্ধ-সূচী

আদিশুন্দের প্রাচীন উল্লেখ—অধ্যাপক অনন্তলাল ঠাকুর, এম. এ.	...
ঐ আলোচনা—পত্রিকাধ্যক্ষ	...
পুথির শেষ কথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	...
বাংলা বিরামাদি চিহ্ন—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি	...
বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	...
বাংলা সাময়িক-পত্র (১২৮২—১২৯০)—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...
বাঙ্গালার মূর্তিবিজ্ঞা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী	...
ভারতীয় সূর্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	...
ভাষা চতুর্ভূতরূপ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...
মধুরানাথ তর্কবাসীশ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...
বটপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্যবিবরণ	...

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দুটী

বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	১
বাংলা সাময়িক-পত্র (১২৮৯—১২৯০ সাল)—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
ভারতীয় স্বর্ণপুজার একটি বৈশিষ্ট্য—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	২৫

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
নব-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থ

মহিলা : সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	২১
ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (বাঁধাই)	১০১
নারদামঙ্গল : বিহারিলাল চক্রবর্তী	১১
শংবাদপত্রে সেকালের কথা : ১ম ও ২য় খণ্ড ১০১ + ১২১০	
পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ	
স্বতোম পাঁচাচার নকশা (সচিত্র)	৪১০
সীতার বনবাস : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১১
বাংলা সাময়িক-পত্র (ইং ১৮১৮—১৮৬৮)	৫১
চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (৪র্থ সংস্করণ)	৬১০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

গ্রন্থকার : শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বহু চিত্রে সূশোভিত

১৭২৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের গণের ও সাধারণ নাট্যশালাঃ ইতিহাস সমসাময়িক উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ৪৮

স্বপ্ন

গ্রন্থকার : শ্রীগিরীশশেখর বসু

এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রহস্য উন্মোচিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যায়, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ-শাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি একটি নূতন অধ্যায়ে সম্মিলিত হইয়াছে ইহা পাঠে স্বপ্ন সম্বন্ধে সাধারণের সকল কোতূহল নিবৃত্ত হইবে। মূল্য ২৥০

গৌড়পদতত্ত্ববিদী

সম্পাদক : মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত জগদ্বন্ধু ভট্ট-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে খ্রীষ্টেতম্ব সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগণের রচিত প্রায় দেড় হাজা-প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় ঐ সকল পদকর্তাদের পরিচয় এবং বৈক্য-সাহিত্যের ধারাবাহি ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্বক্য আছে। মূল্য পাঁচ টাকা।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রধান সম্পাদক : শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকগণের জীবনী ও কীর্তিকথা। এ-পর্বাঙ্ক কালীপ্রসন্ন সিংহ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাসেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ৭৮ খানি চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে বর্ণাক্রমে ১১.০ ও ১.৫ ছয় খণ্ডে বাঁধানো ৭২ খানি পুস্তক ৩৬

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা

১। ব্রজেননাথ মজুমদার ... ৫০

২। বলদেব পাণ্ডিত ... ৫০

৩। জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...

১০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

হিন্দুসমাজের গড়ন

নির্মলকুমার - রু

নৃতত্ত্ববিদের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, সুতরাং হিন্দুসমাজ গঠনের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস অর্থাৎ
। ন বিশেষ-বিশেষ অবস্থায়, ঘটনায়, পরিবেশে এই সমাজের কোন্ কোন্ অঙ্গ কি ভাবে
। ত হইয়াছে এবং কি ভাবে তাহা দেশের মাটিতে মূল প্রবেশ করাইয়াছে, কি ভাবে এক
। ণ্ডী বা সম্প্রদায় আর এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, কি ভাবে একের
। উজ্জতা বা সংস্কৃতি অন্নের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহার অতি চিস্তাকরক বর্ণনা আছে
। বহিতে। বইখানিতে বহু তথ্যপূর্ণ বারোটি অধ্যায় আছে, স্বজাতির যে কোনো
। তহাসের অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক-হিসাবেই যে ইহার মূল্য তাহা নহে, স্বতন্ত্র একখানি নির্ভর-
। গ্য ইতিহাস হিসাবে ইহার পৃথক্ মূল্য পাঠক মাত্রেরই কাছে অস্বত্ব হইবে। অনেকগুলি
। টোপোগ্রাফ ও প্রাসঙ্গিক চিত্র ও নকশার সাহায্যে বর্ণিত বিষয়কে সরল করা হইয়াছে।
। লা ভাষায় ইহা একখানি উৎকৃষ্ট প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।” —যুগান্তর

। রতীয় বর্ণব্যবস্থাকে আমরা একভাবে দেখিতে অভ্যস্ত, কিন্তু নিপুণ ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে
। মরা ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থ নৈতিক সংগঠনকে এক নূতন রূপে দেখিতে পাইলাম।
। শ্রম ও আমাদের আর্থিক সংগঠন যে এমন অদ্বাদ্ধভাবে বিজড়িত ছিল এ-বিষয়ে ইঙ্গিত
। রমা লেখক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার একটি নূতন দিক্ খুলিয়া দিয়াছেন।” —প্রবাসী
। সচিত্র ॥ মূল্য আড়াই টাকা

এই গ্রন্থমালার অন্যান্য পুস্তক

। স্বপরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ নবম মুদ্রণ ॥ দেড় টাকা
। স্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ॥ জরেন ঠাকুর ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ নয় সিকা
। শিরি পরাজয় ॥ শ্রীচরুচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ দেড় টাকা
। রতদর্শনসার ॥ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ • তিন টাকা চার আনা
। ংলা উপন্যাস ॥ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দুই টাকা
। রতের ভাষা ও ভাষাসমগ্র ॥ শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ নয় সিকা
। ংলা সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ পাঁচ সিকা
। ংগতত্ত্ব ॥ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ দেড় টাকা
। হার ও আহাৰ্য ॥ শ্রীপদ্মপতি ভট্টাচার্য ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ পাঁচ সিকা
। স্বপরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ পাঁচ সিকা

বিশ্বভারতী

৬৩ ছারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

রামেন্দ্র-রচনাবলী

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমগ্র গ্রন্থ ও মাসিক-পত্রের

পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রচনাবলী

প্রকাশিত হইয়াছে

প্রথম খণ্ড : 'প্রকৃতি,' 'জিজ্ঞাসা' এবং 'বদলস্বীর ব্রতকথা'। মূল্য ৮

দ্বিতীয় খণ্ড : 'কর্ষ-কথা,' 'চরিত-কথা,' 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' ১ম ও ২য় পর্ষ্যায়। ৮

তৃতীয় খণ্ড : 'শব্দ-কথা,' 'বিচিত্র জগৎ' ও 'যজ্ঞ-কথা'। ১০।

চতুর্থ খণ্ড : 'নানা কথা,' 'জগৎ-কথা,' 'পুণ্ডরীককুলকীর্তিপঞ্জিকা'। ১০

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্লভ-সম্পাদিত

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল

মূল্য সাড়ে ছয় টাকা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী

সার্ব শ্রীযত্ননাথ সরকার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ভূমিকা লিখিয়াছেন।

উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত।

মূল্য : পাঁচ খণ্ডে বাঁধানো রাজ-সংস্করণ.....৪০

সকল পুস্তকই খুচরা কিনিতে পাওয়া যায়।

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

কাব্য এবং নাটক গ্রন্থসনাদি বিবিধ রচনা

সমগ্র গ্রন্থাবলী এক খণ্ডে বাঁধানো.....১৮

সকল পুস্তকই খুচরা কিনিতে পাওয়া যায়।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

(১) সহমরণ পুস্তকাবলী...১৫০ টাকা। (২) চারি প্রশ্ন বিষয়ক আলোচনাদি...৩০ টাকা

দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড—কাব্য-কবিতা-গান.....১০

ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর-রচিত

শকুন্তলা...১

সীতার বনবাস—১

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ ও রামেন্দ্রচন্দ্রের স্বতন্ত্র বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন^১। এই ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে সর্বথা উপেক্ষা করিবে না সত্য, তবে অঙ্কভাবে ছবছ অঙ্ককরণও করিবে না। রবীন্দ্রনাথের কথায় ‘বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে’ (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।৫৭৮)। বস্তুতঃ ‘বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কিয়দংশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, কিয়দংশে নহে’^২। মোটামুটি ভাবে, বাংলা ভাষার ব্যাকৃত ‘সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে সংস্কৃতের নিয়ম চলিবে; সে নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।...কিন্তু বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম চলিবে। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ অগ্রাহ্য’^৩ তবে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগেও বাংলা ভাষায় সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়ম স্বাধীকৃত ভাবে প্রতিপালিত হয়, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। নানা প্রসঙ্গে সংস্কৃতের নিয়ম উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই নিয়ম লঙ্ঘন অবশ্যই নিছক যথেষ্টচারিতার পরিচায়ক নহে। অজ্ঞতা ইহার মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই—তবে অনেক ক্ষেত্রে ইহার অন্তরালেও যে একটা ভাষাতত্ত্ব-সম্মত যুক্তি, শৃঙ্খলা ও নবীন নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তাহাও স্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবল দোষদর্শন বৈয়াকরণের কার্য্য নহে—বহুল প্রচলিত প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে যতই নিয়মবিরুদ্ধ হউক না কেন, প্রাচীন নিয়মকে একটু ব্যাপক ও শিথিল করিয়া বা নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তাহার সমর্থনের চেষ্টা বৈয়াকরণের অবশ্যকর্তব্য কর্ম্ম। ইহা ব্যক্তিগত মতবাদ মাত্র নহে, ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য। তাই প্রাচীনেরা বলিতেন ‘স্থিতৈর্গতিশ্চিন্তনীয়’—যাহা বর্তমান, যাহা প্রচলিত তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই অজুই দেখা যায়—অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নূতন নূতন প্রয়োগ সমর্থনের^৪ অল্প বিভিন্ন বৈয়াকরণ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন, নানারূপ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন—সহসা কোন প্রয়োগকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন নাই। এ বিষয়ে বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতার কর্তব্য অরণ করা ইয়া দিবার অল্প রবীন্দ্রনাথ বাংলা ব্যাকরণের লক্ষ্য নির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—[বাংলা ভাষা] সংস্কৃত ও অল্প ভাষার আয়দানিকে কি ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার অল্প বাংলা ব্যাকরণ’ (রবীন্দ্র-রচনাবলী—১২।৫৬২)।

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী—ষাদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৫৪, ৬০১। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১, ২০১।

২। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—বাঙ্গালা ভাষা, পৃঃ ১০৮। ৩। রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী—শব্দকথা, পৃঃ ১৫৭।

ভূগর্ভের বিষয়, প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলিতে এ দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। সংস্কৃত নিয়মালুসারে ঋগ্‌টি বাংলা প্রয়োগের বিশ্লেষণেও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের তাৎপর্য উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা ব্যাকরণের এইরূপ কয়েকটি প্রসঙ্গের প্রতি বৈয়াকরণ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা যাইতেছে। — সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লক্ষ্যন করিয়া যে সকল শব্দ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ সমর্থন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণকে উপেক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন করাই আমার কার্য। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই ব্যাকরণবিরোধী শব্দ চালাইতে পারিবেন, এমন কথাও বলা চলে না। বহুপ্রচলিত শব্দগুলিই আমার আলোচনার বিষয়। বৈয়াকরণ বা আভিধানিক কেহই এগুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না। বস্তুতঃ উপেক্ষিত হইলেই যে শব্দগুলি আর ব্যবহৃত হইবে না, এমনও বলা চলে না। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৩৫০ শ্রাবণ) ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম। বর্তমান ক্ষেত্রে নূতন উপাদান সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য।

ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণ অল্পসারে আমার বক্তব্যগুলি সঙ্জিত করিয়াছি। প্রত্যেক প্রকরণে এতদতিরিক্ত খুঁটিনাটি আরও অনেক বিচার্য বিষয় আছে। একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাহাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। অথচ বাংলা ব্যাকরণকে তাহার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রয়োজন। বিভিন্ন লেখকের লেখা বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ ও অনৈক্য রহিয়াছে, তাহাদেরও সুমীমাংসার চেষ্টা কণার সময় আসিয়াছে। এ অল্প বাংলা ভাষাবৈজ্ঞানিক ব্যক্তিমাত্রের আগ্রহ ও সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

সন্ধি।—উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংস্কৃতের সন্ধির নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে বাংলায় উপেক্ষিত হয়। সমাসবদ্ধ পদসমষ্টির মধ্যে সকল স্থানে পরস্পর সন্ধি না করার একটা প্রথা বর্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আধুনিক বাংলায় এরূপ স্থলে সন্ধি করিলেই যেন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। সত্য সত্যই ব্যাকরণের শাসন সত্ত্বেও ‘প্রতিষ্ঠা-উৎসব’, ‘প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে’ না বলিয়া ‘প্রতিষ্ঠোৎসব’ ‘প্রতিষ্ঠোপলক্ষ্যে’ বলিতে কানে ঠেকিবে। অল্প দিকে সন্ধি না করিলে শব্দের আয়তন সংক্ষেপ না হওয়ায় উহার ধ্বনিগাঙ্গীর্ষ অরক্ষিত হয়।

বিসর্গ স্থানে ‘র’ প্রভৃতির ব্যবস্থা বাঙালীর দিক্ হইতে অনেক ক্ষেত্রে ঐতিকটুতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ঋগ্‌টি বাংলা শব্দে বিসর্গ নাই—শব্দের অন্তে বিসর্গের উচ্চারণ হুঃসাধ্য। তাই বিসর্গ এখন বাংলার অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইতেছে। চক্ষুদান, চক্ষু চিকিৎসা, চক্ষুগোচর, চক্ষুরোগ, জ্যোতিষ্ময়, তেজী, মনাস্তর প্রভৃতি বহু শব্দে বাঙালী বিসর্গকে বেমানুষ বাদ দিয়া দিয়াছে। ‘মনঃকষ্ট’ বিসর্গের সহিত উচ্চারণ করা কঠিন বলিয়া বাঙালী উহাকে ‘মনোকষ্ট’ করিয়া লইয়াছে। মনোমোহন, জগমোহন, জগদ্বন্ধু উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাহার কাছে মনমোহন, জগমোহন, জগদ্বন্ধু রূপ ধারণ করিয়াছে। সাহিত্যের

ভাষায় সর্বত্র একরূপ লেখার ব্যবহার না থাকিলেও শব্দগুলি বাংলা ভাষায় প্রকৃতি নির্দেশ করে সন্দেহ নাই।

সমাস।—প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণগুলিতে বাংলা পদের সমাস নিরূপণে সাধারণতঃ সংস্কৃত নিয়মই অঙ্গুলত হইয়াছে সত্য। তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবশ্য করণীয়। এই প্রসঙ্গে তৎপুরুষ সমাসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৎপুরুষ সমাসের বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত উদাহরণ সাধারণতঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে, স্বল্পভাবে পর্যালোচনা করিলে সেগুলি ঠিক সেই সমস্ত বিভাগের মধ্যে পড়ে কি না, তাহা বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। ষাঁটি বাংলা শব্দের প্রসঙ্গে তৎপুরুষের শ্রেণী-বিভাগের সমস্তা কঠিন। বাংলায় প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি না থাকায় দ্বিতীয়াস্তাদি পদের সহিত বিহিত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ প্রভৃতি নামকরণে অসুবিধা আছে। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্যই বোধ হয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বঙ্গানিধি মহাশয় একরূপ নামকরণ করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি কোনও নামই দেন নাই—পূর্বপদের কারকের নাম উল্লেখ করিয়া কর্মকারকে, করণকারকে, সম্প্রদানকারকে প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে তৎপুরুষের উদাহরণ দিয়াছেন। (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ২১৫)। কিন্তু সমস্তার সমাধান ইহাতেও হয় নাই—এ পদ্ধতি অল্প কেহ অঙ্গুলত করিয়াছেন বলিয়াও জানি না। কারক বা বিভক্তি যে অঙ্গুলারেই শ্রেণী-বিভাগ করা হউক না কেন, প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে যে সব উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি সংস্কৃত নিয়মবিরোধী—কোন কোন স্থলে বাংলা বিশ্লেষণেও তাহাদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। দ্বিতীয়া তৎপুরুষের দৃষ্টান্তগুলির ব্যাসবাক্য বাংলা ভাষায় একরূপ অচল—কাপডকে ধোয়া, ভাতকে খাওয়া, বাসনকে মাজা আমরা কখনও ভাষায় ব্যবহার করি না। পক্ষান্তরে সাধু ভাষায় পরিবর্তিত করিলে এই শব্দগুলিকে আর দ্বিতীয়া তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত বলা যায় না—‘বস্ত্রধাবন’ নিঃসন্দেহে সর্বত্রই বস্ত্রতৎপুরুষনিপ্পন্ন বলিবেন। অবশ্য কাপড়ের ধোয়া, বাসনের মাজা একরূপ কথাও আমরা ভাষায় ব্যবহার করি না। তবে একরূপ ব্যাসবাক্য দেখাইয়া বস্ত্রতৎপুরুষ সমাস বলিলে যুক্তিসঙ্গত হয় এবং সাধু ভাষার সহিত সামঞ্জস্য বজায় থাকে। চতুর্থী তৎপুরুষরূপে নির্দিষ্ট বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত নিয়মানুসারে বস্ত্রতৎপুরুষনিপ্পন্ন। সুতরাং বাংলায়ও সেইরূপ বলাই সঙ্গত। গৃহদ্বারা, ঘরছাড়া, গোলাভরা প্রভৃতি শব্দগুলিকে তৎপুরুষ-নিপ্পন্ন না বলিয়া বহুব্রীহিনিপ্পন্ন বলিলেই শোভন হয় বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ, ‘গোলায় ভরা’কে সপ্তমীতৎপুরুষ বলিলে প্রকৃত তাৎপৰ্যই পরিফুট হয় না। ‘গোলায় ভরা’ যে কোন পরিমাণের ধানকেই আমরা ‘গোলাভরা ধান’ বলি না—ভরা বা পরিপূর্ণ গোলা বাহার দ্বারা, তাহাকেই ‘গোলাভরা’ বলিয়া থাকি। সুতরাং এস্থলে বহুব্রীহি সুস্পষ্ট। বিশেষণের পরনিপাতও সংস্কৃত নিয়মসিদ্ধ এবং বাংলা প্রয়োগের সর্বথা অঙ্গুল। ঘোমটা-পরা মেয়ে, আলপনা আঁকা দেয়াল, ফুলতোলা রুমাল, বগছাড়া ছেলে প্রভৃতি

চলতি ভাষার শব্দ ছাড়া পট্টজ্ঞ-পরিহিত, আত্মবিশ্বস্ত, মতিচ্ছন্ন, নদীজপমালাযুত প্রভৃতি সাধু ভাষার শব্দেও এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানিবি মহাশয় তাই স্পষ্টতঃ নিয়ম-নির্দেশ করিয়াছেন—বাঙ্গালাতে বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ আছে; কুৎপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণপদ বিশেষ্যের পরে যায় (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ. ২১৭)। এতৎসঙ্গেও বিভিন্ন ব্যাকরণ গ্রন্থে এ জাতীয় শব্দকে যে বিভিন্ন সমাসের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ তাহাতে অর্থের জুসঙ্গতি করাও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

সমাসনিরূপণের সময় অর্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার—অর্থসঙ্গতি থাকিলে একই পদকে বিভিন্ন সমাসসিদ্ধ বলিতেও কোন আপত্তি নাই। যত দিন সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হইবে, তত দিন সংস্কৃতের নিয়মও একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সংস্কৃত নিয়মামুসারে প্রত্যাকর, বিভাকর প্রভৃতি শব্দে বস্তুতঃ পুরুষ না বলিয়া উপপদ তৎপুরুষ বলিবার কি কারণ থাকিতে পারে? উপপদ তৎপুরুষ করিলে সংস্কৃতে এগুলির রূপ দাঁড়াইবে কর্মকার, চর্মকারের মত প্রত্যাকর, বিভাকর। অবশ্য ধনহীন প্রভৃতি শব্দের বেলায় হয়ত আমরা সংস্কৃত নিয়ম যথাযথ অনুসরণ না করিতেও পারি। ‘ধনের দ্বারা হীন’ এরূপ ব্যাসবাক্য বাংলায় অতিশয় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। এখানে ‘ধনে হীন’ বলিয়া সপ্তমীতৎপুরুষ করিলে শোভন হইতে পারে। বস্তুর অভিপ্রেত অর্থানুসারে সংস্কৃতে যখন কারক ও বিভক্তি ব্যবহারে স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে (বিবক্ষাতঃ কারকানি ভবন্তি), তখন ইহা একেবারে সংস্কৃতবিরোধীও হইবে না। বাংলা সমাসের বহু স্থলে এইরূপ খুঁটিনাটি আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

এইবার আপাতদৃষ্টিতে সংস্কৃত নিয়মবিরোধী বহুলপ্রচলিত কতকগুলি শব্দের আলোচনা করিব। নির্দোষী, নিরপরাধী প্রভৃতি শব্দ বাংলা ব্যাকরণে সাধারণতঃ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। অথচ এজাতীয় অজস্র প্রয়োগ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়—সাহিত্যিকদের লেখন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইতে পারে। নিরুপদ, নির্ভাবনা, নিরাশা, নিরুত্তম্যানী, নির্লিপ্ত, নির্বিরোধী, নিরুদ্বেগ, নিরুদ্ধিষ্ট, নিঃসঙ্গী, নিরলস, নির্বিবাদী, নির্বাসিত, নিরাসক্ত, নিশ্চঞ্চল (রবীন্দ্রনাথ)। নিরবচ্ছিন্ন, নিরবন্ত, নিরশন প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতেও একেবারে অপরিচিত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে এতগুলি শব্দকে স্রাস্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া লাভ নাই। বরঞ্চ ‘নিঃ’ শব্দ এখানে অভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিয়া এগুলিকে নঞতৎপুরুষ বা প্রাদিতৎপুরুষের রূপভেদ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৪। স্বাভাবিক সমস্তমান পদের সাহায্যে এই অর্থ নিরূপণের চেষ্টাই ব্যাসবাক্যের কার্য। এক্ষণে ব্যাসবাক্যে সমস্তমান পদাতিরিক্ত নূতন পদসম্মিলন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। বস্তুতঃ ‘খাইখরচের ব্যাসবাক্য ‘খাওয়ার খরচ’ না করিয়া ‘খাইয় খরচ’ বলা উচিত। (খাওয়া অর্থে খাই শব্দের প্রচলন উত্তরবঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়)। অজস্রও এইরূপ।

সচল, সচকিত, সশক্তি, সক্ষম, সঠিক, সফাতর, সফল, সচঞ্চল (আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর—নবীনচন্দ্র) প্রভৃতি শব্দও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অসুস্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বাংলায় বহুল ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদেরও একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্তুতঃ এসকল স্থানে সংস্কৃত নিয়মানুসারে বহুব্রীহি সমাস হয় নাই—এখানে সংস্কৃতের মত ‘স’ ‘সহ’র বিরূতি নয়—ইহা বাংলায় আতিশয়াবাচক স্বতন্ত্র শব্দ বা অর্থহীন ধ্বনি মাত্র। চলতি ভাষার ‘সাবকাশ’ শব্দেও এই ‘স’এরই সন্ধান মিলে। বলরাম কবিশেখর তাঁহার কালিকামঙ্গলে এইরূপেই ‘সাদর করিয়া’ ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলা শব্দে গঠিত বহুব্রীহি সমাসে অনেক স্থানে পরপদে আকারবোগের যে প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলায় ব্যবহৃত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দেও সেই নিয়ম অমুপস্থিত হইতেছে দেখা যায়। অভাগা, হতভাগা, দুর্ভাগা, নির্জলা, নিফলা প্রভৃতি শব্দে ইহার দৃষ্টান্ত মিলে। অথচ সংস্কৃতমতে যেখানে আকার অভিপ্রোক্ত, সেখানে ‘ঈ’কার ব্যবহারের বোঁক দেখিয়া বিম্বিত হইতে হয়। সহকর্মী, স্নেহকর্মী, বিধর্মী, জীবাত্মনাশকর্মী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য ঈকার সংস্কৃতমতে সমর্থন করা কঠিন। অবশ্য সংস্কৃতও সহকর্মী শব্দের প্রয়োগ আছে। সমাসান্তবর্তী বিশেষণ মহৎ শব্দকে মহারূপে পরিবর্তনের বিধান সংস্কৃতে থাকিলেও বাংলায় এখন অনেকেই মহরূপকার, মহদাশয় বা মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি লিখিতে দ্বিধা বোধ করেন না। অবশ্য এখনও কেহ মহৎপুরুষ শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন নাই। পক্ষান্তরে সংস্কৃতমতে অকারান্ত মহারাজ শব্দই বিদ্যুৎ বলিয়া বিবেচিত হইলেও রাজার সাদৃশ্যে মহারাজা শব্দ ব্যবহার করিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করেন না। বাংলায় পছা একটি স্বতন্ত্র শব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় কর্মপছা প্রভৃতি প্রয়োগ চলিতেছে। ভাষার ঐ বৈচিত্র্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মতই ছুরবগাহ।

অমুবাদমূলক বিলাতিগন্ধি কতকগুলি শব্দের সম্ভাবজনক বিশ্লেষণ হুঃসাধ্য। ইহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এগুলি ইংরাজির আক্ষরিক অমুবাদ—শব্দগুলির বিশ্লেষণের দ্বারা অভিপ্রোক্ত অর্থ পাওয়া যায় না। জন্মবার্ষিকী, শতবার্ষিকী প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।* মনোমুগ্ধকর আইন অমান্তকারী, সাধ্যাতীত, সহস্রান্তি প্রভৃতি স্থানে বিশেষণপদগুলি বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ধরিতে হইবে। বস্তুতঃ চলতি প্রামা ভাষায় কোথাও কোথাও মাস্ত, অমাস্ত ও সাধ্য স্বতন্ত্রভাবেও বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কৃতপ্রত্যয়।—কৃতপ্রত্যয়ের মধ্যে শত্, শানচ্ ও ক্ত প্রত্যয়ের ব্যবহারের বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ও চলতি বাংলায় শত্ প্রত্যয়ের বাংলা রূপের নিদর্শন উঠন্ত, পড়ন্ত, বাড়ন্ত,

*। নূতন শব্দ গঠনের সময় বিশেষ সতর্ক না হইলেই এইরূপ অমুবিধার গড়িতে হয়। এই অসতর্কতার ফলে বর্তমানে বাংলা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য ও অশ্লীল হইয়া পড়িতেছে—ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠককে বহু স্থলে ইংরাজির ধারকত বাংলায় অর্থ করিতে হয়। ইহা বিশেষ দৈহিকের কথা সন্দেহ নাই।

জলন্ত, চলন্ত, ঘুমন্ত, পড়তি বেলা, উঠতি বয়স, বহতা নদী প্রভৃতি শব্দের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যে বা সাধু ভাষায় এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় না। তাহার স্থলে শানচ প্রত্যয়ের বা তাহার 'মান'রূপের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এই প্রত্যয় কেবল আত্মনেপদী ধাতুর পরই ব্যবহৃত হইতে পারে। বাংলায় কিন্তু ইহা নির্বিচারে ব্যবহৃত হইতেছে। এমন কি, শব্দের পরও এই প্রত্যয়ের ব্যবহার করিয়া 'অন্তমান' শব্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইরূপ অবাধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে চলমান, ভ্রাম্যমাণ, মুহমান, ক্রন্তমান, ভাসমান, মজ্জমান, প্রশংসমান প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বক্ষ্যমাণ শব্দটা উল্লেখযোগ্য। আকৃতি দর্শনে কেহ কেহ ইহাকে চলমানাদি শব্দের মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন সত্য, তবে ইহার আসল অর্থ—'যাহা বলা হইতেছে' নয়, কিন্তু 'যাহা বলা হইবে।'

ঐ প্রত্যয় ব্যবহারে বাংলায় যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে বাংলা শব্দে ধ্বনিগৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে মনে হয়। ভাই মূল ধাতুকে অকারণে শিথিল করা হয় এবং ধাতুর উত্তর অস্থানে ইকার যুক্ত হয়। ফলে বিস্তৃত স্থলে বিস্তারিত, প্রস্তুত স্থলে প্রস্তুতবিত, অনুদিত স্থলে অনুবাদিত, খাত স্থলে খনিত, স্পৃষ্ট স্থলে স্পর্শিত, কুণ্ড স্থলে কর্ষিত, ব্যাচ স্থলে বিবাহিত, আবৃত স্থলে আবরিত, আহত স্থলে আহরিত, ক্ষীণ স্থলে ক্ষয়িত, বিবৃত স্থলে বিবরিত, সিক্ত স্থলে সিক্তিত, বিতীর্ণ স্থলে বিতরিত প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

সকর্মক ধাতু ঐ প্রত্যয়ান্ত হইলে তাহা কর্মের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্পদষ্ট বলিতে আমরা যাহাকে দংশন করা হইয়াছে, তাহাকে বুঝি, দংশনকর্তাকে বুঝি না। কচিং ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এই ব্যতিক্রমকে সমর্থন করিবীর জন্য বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। চলতি বাংলায় কিন্তু এইরূপ একাধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—শ্রুত আছি, জ্ঞাত আছি, তুমি ভূক্ত না অভূক্ত, তিনি স্বীকৃত হইলেন। সংস্কৃতরসিকের নিকট বাংলার এই প্রয়োগগুলি বিশেষ কৌতূহলের বিষয় সন্দেহ নাই।

ধ্বনিসাম্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় বিকরণ স্থলে ত্রিকরণ, উদগরণ স্থলে উদ্গরণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সিঞ্চন, স্ফজন, জাগ্রত—শব্দগুলি সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও আজ বাংলায় তাহাদের অধিকার পাকা করিয়া লইয়াছে।

এই প্রসঙ্গেই নামধাতুর কয়েকটি বিচিত্র প্রয়োগের উল্লেখ করা দরকার। অবশ্য ঐ প্রত্যয়ের সহিতই বাংলায় এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে স্তানায়মান, বনায়মান, স্ত্রায়মান, দীর্ঘায়িত, তরঙ্গায়িত প্রভৃতি শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দিষ্ট অর্থের সন্ধান পাওয়া গেলেও রূপায়িত, লীলায়িত এবং রবীন্দ্রনাথের বহুশায়িত ও অলঙ্করণের্থায়িত প্রভৃতি শব্দ নূতন অর্থে রচিত হইয়াছে মনে হয়। এখানেও শব্দকে পল্লবিত করিয়া তাহার ধ্বনিগাঙ্গীর্ণ সৃষ্টির প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। শব্দের বিষয়,

এইরূপভাবে নূতন রচিত উদ্ভেলিত, ব্যাকুলিত শব্দ আপাতদৃষ্টিতে অশুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ইহাদিগকে সংস্কৃত নিয়ম অনুসারেও অনায়াসেই সমর্থন করা যায়। উদ্ভেল করিতেছে, ব্যাকুল করিতেছে, এই অর্থে উদ্ভেল ও ব্যাকুলকে নামধাতু করিয়া নিয়া তাহার পরে ‘জ্ঞ’ প্রত্যয়যোগে দৃষ্ট শব্দ দুইটির অর্থ দাঁড়ায় ‘উদ্ভেলীকৃত’, ‘ব্যাকুলীকৃত’। প্রচলিত অর্থের সঙ্গে এই অর্থের বিশেষ কিছু বিরোধ নাই।

জীপ্রত্যয়।—খাঁটা বাংলা জীপ্রত্যয় সাধারণতঃ জি, ই, ইনী বা ইনি^৬ এই সব প্রত্যয় বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দেও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অভাগী, অভাগিনী, হতভাগী, হতভাগিনী, অধীনী, ননদিনী, ননদী, দিগম্বরী, ভয়ংকরী, কিংকরী, চন্দ্রবদনী, জ্ঞকেশিনী, অর্ধাজিনী, হোমাজিনী, ভুজ্জিনী, উন্মাদিনী—ইহাদের কোনটাই সংস্কৃত নিয়মানুসারে শুদ্ধ না হইলেও বাংলার রীতি অনুসারে দোষহীন। চণ্ডীদাসের রজনিকিনী, কুন্তিবাসের পাণিঞ্জী বাংলার এই নিয়মেরই সাক্ষ্য বহন করে।^{*} সম্ভবতঃ এই প্রথার অনুসরণ করিয়াই মধুসূদন গায়কী, নায়কী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি যত বড় সাহিত্যিকই হউন না কেন, নূতন শব্দ দৃষ্টি করিলেই ভাবা তাহা নির্বিবাদে মানিয়া লয় না। তাই আলোচ্য বিষয়ে চণ্ডীদাস, কুন্তিবাস বা মধুসূদনের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হয় নাই। তবে ব্যাকরণরচয়িতার পক্ষে বাংলার এই বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলিয়াছেন—‘বাংলায় জীলিঙ্গে ‘ইনি’ ‘ই’ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃতব্যাকরণের ছাঁচ মানে না। সে বাঙালী হইয়া আর এক পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে।...সংস্কৃত বিধানমতে সে কোথাও জীলিঙ্গে আকার মানে না, এই জন্য সে অধীনাকে অধীনী বলে’^৭ (রচনাবলী ১২।৫৭০)। এই প্রসঙ্গে অরণ্যানী শব্দের আদর্শে রচিত বনানী শব্দটা অরণীয়।

পুরাণ বাংলায় কোন কোন স্থলে আকারান্ত বালা, প্রিয়া প্রভৃতি শব্দ জীলিঙ্গে ব্যবহৃত না হইয়া পুংলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আকারান্ত বলিয়াই শব্দকে জীলিঙ্গ বলিয়া মনে করিবার দৃষ্টান্তও বাংলায় পাওয়া যায়। তাই অগিমা, নীলিমা, সবিতা প্রভৃতি মেয়েদের নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়—সাহিত্যের ভাষায়ও কোন কোন স্থলে নীলিমা প্রভৃতির বিশেষণে জীলিঙ্গের ব্যবহার দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলায় জীপ্রত্যয়ের ব্যবহার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা দরকার। বিশেষণে জীপ্রত্যয়ের ব্যবহার দিন দিন কমিয়া যাইতে থাকিলেও জী প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহারের যৌক বাড়িয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রে একরূপ অকারণেই জী-প্রত্যয়ের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উদাহরণ—শতবার্ষিকী, স্মৃতিবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী, চয়নিকা, চলন্তিকা, রবিনীপিতা, বিবরণী প্রভৃতি। কোন কোন স্থানে

৬। অবশ্য দুই এক স্থলে যে সে আকারও ব্যবহার করে না, এমন নয়। অশ্রোজনেও সে ‘আম্পদ’ শব্দকে জীলিঙ্গ করিতে যাইয়া ‘আম্পাদ’ ব্যবহার করিয়া বসে। বলা, ব্রহ্মাম্পদা, মেহাম্পদা প্রভৃতি।

এগুলিকে পুংলিঙ্গ শব্দের বিশেষণরূপেও ব্যবহার করা হয়। যথা, আগমনী গান, জন্মবার্ষিকী উৎসব, সংশোধনী প্রস্তাব। রামেন্দ্রসুন্দর বহু দিন পূর্বে তাঁহার বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধে এ জাতীয় প্রয়োগের নিন্দা করিয়াছিলেন—প্রযোজ্যদিগের দণ্ডবিধানেনও তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আসল কথা এই যে, বাঙালী গালভরা শব্দ ব্যবহার করিতে চায়—এজ্জন্ত শেষের স্বরকে দীর্ঘ করিতে পারিলে সুবিধা হয় এবং এ সুবিধা জীলিঙ্গের দ্বি প্রত্যয়ে পাওয়া যায় বলিয়াই জীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহারে তাহার আগ্রহ—এ বিষয়ে সে দিগ্‌বিদগ্‌জ্ঞানশূন্য।

ভজিত প্রত্যয়।—সংস্কৃত ভজিত প্রত্যয়ের মধ্যে ‘ক্ষিক’ নামে প্রচলিত প্রত্যয়টির বহুল ব্যবহার আধুনিক বাংলায় দেখা যাইতেছে। কোন বিশেষ্যকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করিতে হইলে প্রায়শঃ এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে নবগঠিত শব্দগুলির স্থলে এই ব্যাপারে প্রাচীন নিয়ম সাধারণতঃ অম্লম্বৃত হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এই প্রত্যয় যোগ করিলে সাধারণতঃ পূর্বপদের প্রথম স্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিশেষ বিশেষ স্থলে উভয় পদেরই প্রথম স্বর বা দ্বিতীয় পদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়। বাংলায় কিন্তু বৈশীরা ভাগ স্থলেই পরপদের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি করা হয়। যথা—অর্থনৈতিক, সমাজ-তান্ত্রিক, সমসাময়িক প্রভৃতি। প্রাচীন শব্দের বেলায়ও হুই এক স্থলে এই রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রাচীন মতানুসারে ঐহলৌকিক না লিখিয়া কেহ কেহ ঐহলৌকিক লিখিয়া থাকেন। অথচ ইংরাজি রীতির অঙ্ক অনুকরণে রচিত আন্তর্জাতিক, আন্তঃপ্রাদেশিক প্রভৃতি শব্দে হুই পদেরই বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে।

কালবাচক অব্যয় শব্দের পরে বিহিত তন প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় অন্তর্ভুক্তও ব্যবহৃত হইতেছে। যথা—উদ্বর্তন, উচ্চতন, পূর্বতন, নিম্নতন প্রভৃতি। আলু ও মতুপ্ প্রত্যয়ের ব্যবহারেও এইরূপ ব্যাপকতা লক্ষিত হয়। চলতি উচ্চারণ ও কোন কোন স্থলে মতুপ্-প্রয়োগের অম্লকূল।

কতকগুলি বিশেষ্য শব্দের পরে ‘তাব’বাচক ‘তা’ প্রত্যয় বৈয়াকরণের ক্রকুটি সত্ত্বেও অসঙ্কোচে ব্যবহৃত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্ভরতা, নিশ্চয়তা, প্রসারতা, উৎকর্ষতা প্রভৃতি প্রয়োগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার বিশেষণ শব্দের পরেও দ্বিকার যোগ বাংলায় কুশলী, সাবধানী প্রভৃতি শব্দে দেখা যায়। সংস্কৃতানুসারে এগুলিকে স্বার্থিক প্রত্যয় বলা চলে অর্থাৎ এগুলি মূল শব্দের নিজের অর্থই প্রকাশ করে মাত্র। অনন্ত বিশেষ্যরূপে বিশেষণের এবং বিশেষণরূপে বিশেষ্যের ব্যবহারও বাংলায় বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। সততা শব্দে শব্দের মূল রূপটিই উপেক্ষিত হইয়াছে। একত্র মিলিত অর্থে একত্রিত শব্দের ব্যবহার সংস্কৃতের অম্লমোদিত না হইলেও বাংলায় বহুল প্রচলিত। গালভরা শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শব্দগুলিকে কাঁপাইয়া তুলিবার চূড়ান্ত নিদর্শন ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

এইরূপ আরও বহু শব্দ ভাষার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের সংকলন ও সমালোচন বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ভাষাতত্ত্ববিদ ও সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের সম্মিলিত চেষ্টায়ই ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। বাংলা ব্যাকরণকে নিদোষ ও সম্পূর্ণ করিবার জন্ত এ বিষয়ে অধীশমাজকে অবহিত হইতে হইবে।

বাংলা সাময়িক-পত্র—৬

১২৮৯—১২৯০ সাল (এপ্রিল ১৮৮২—এপ্রিল ১৮৮৪)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাহ (মাসিক)। ১ বৈশাখ ১২৮৯ (এপ্রিল ১৮৮২)।

দামোদর মুখোপাধ্যায় এই মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১ম সংখ্যার স্থচনায় পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন :—

“প্রথমতঃ, সময়ের সহিত সাময়িক পত্রের বিশেষ সম্বন্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান সাময়িক পত্র সমূহ প্রায়ই নিতান্ত অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহাতে পাঠকের অতিশয় অপ্রীতি জন্মে, কার্যের নিতান্ত বিশৃঙ্খলা হয়, এবং উদ্দেশ্য সাধনের বিষয় ঘটে। আমাদের প্রবাহ প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবে। সুতরাং অল্প পত্র সমস্ত সঙ্কেত প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রবাহ কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিবে না। প্রবাহ আত্মীয়ের সমাদর বা অনাত্মীয়ের হতাদর করিবে না।...প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনভাবে কার্য করিবে। তৃতীয়তঃ, যাহা সাধারণের বোঝাশীত, বা যাহা নীরস, বা যাহাতে প্রয়োজন নাই, প্রবাহ কখনো তাহাতে হস্তার্পণ করিবে না। যাহা সাধারণের কল্যাণকর, যাহার সহিত দেশের বা সমাজের উন্নতির সম্বন্ধ আছে, যাহার সহিত সকলের হিত, আনন্দ, অমুখ্য ও উন্নতির সম্বন্ধ আছে, তাহাই প্রবাহের আলোচ্য হইবে।...চতুর্থতঃ, যে সকল রাজকার্যের সহিত সর্বসাধারণের ইষ্টানিষ্টের অধিক সম্বন্ধ ঘেঁষিবে প্রবাহ তাহার সমালোচনা করিবে।...পঞ্চমতঃ, প্রবাহ সমসাময়িক সমস্ত গণনীয় ঘটনার উল্লেখ বা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিবে। সাহিত্য সম্বন্ধীয়, বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, ইতিহাস সম্বন্ধীয় উন্নতি, অবনতি, নবাবিকার, বা মতান্তর প্রবাহ সকলকে জানাইতে যত্ন করিবে। ষষ্ঠতঃ, প্রবাহ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ সমাদর করিবে।...সপ্তমতঃ, নাটক ও অভিনয় সময়ে সময়ে জাতীয় উন্নতি, বা অবনতির প্রধান হেতু হইয়া থাকে। এই জন্য প্রবাহ নাটক ও প্রকাণ্ড বা অপ্ৰকাণ্ড রঙ্গমঞ্চে তাহার অভিনয়ের গুণাগুণ সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিবে। অষ্টমতঃ, প্রবাহ বিশ্বাস করে যে বঙ্গভাষায় এখন নিতান্ত ক্ষীণ অবয়ব। এ সময়ে জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত যিনি যাহা করেন তাহাই শুভ। এইজন্য প্রবাহ সকল গ্রন্থকারকেই সমাদর করিবে, গ্রন্থের ঘোষের কথা যেমন বুঝিবে তেমনি সরলভাবে ব্যক্ত করিবে, এবং গুণের কথা সানন্দে প্রচারিত করিবে। কিন্তু কখনো অকারণ বিজ্ঞপ্তি করিয়া কাহাকেও হতবাক্য করিবে না, বা মনস্তাপ দিবে না। প্রবাহের এই সকল

সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যে প্রবাহের উদ্দেশ্য অনেক ও বহুব্যাপী এবং তৎসমস্ত সাধনোদ্দেশ্যে কোন সাময়িক পত্রের আবির্ভাব একান্ত বাঞ্ছনীয়।”

‘প্রবাহ’ সে-যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র ছিল।

সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৯ (মে ১৮৮২)।

এই মাসিকপত্র ও সমালোচনের সম্পাদক ছিলেন—প্রাণানন্দ কবিতুষণ; ইহা ৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত হইত। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক ১ম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন :—

“বর্তমান ভারতবর্ষের এই বিজ্ঞান চর্চার প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। হুংবের বিষয়, এ পর্যন্ত কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। শীঘ্রও যে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমরা ইহার সোপানমাত্র গঠনে কৃতসংকল্প হইয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য এই, অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্য ও কৃতচিন্ত লোকেরা আমাদের এই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, আমাদের কল্পিত সোপান বিজ্ঞান-দর্পণ নামে আখ্যাত হইল এবং ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাষায় প্রণীত ও সমালোচিত বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সরল বাক্যলায় অমুবাদমাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে। সেই অমুবাদিত বিষয় যাহাতে বিশদ বা অনান্যাসেই সংপ্রণীত হইতে পারে, তজ্জন্ম চিত্তাধি প্রভৃতি উপায় সকলও অবলম্বিত হইবে। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা বাহ্যিক যে, বিজ্ঞান বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কৃতজ্ঞ ও কৃতকৃত্য বহুদর্শী ব্যক্তিগণই ইহার লেখক-পদে মনোনীত হইয়াছেন।”

‘বিজ্ঞান-দর্পণ’ ত্রিযোগেশচন্দ্র রায়ের “পীপুরিয়া কয়লা,” কাজীবর বেদান্তবাগীশের “বার্তাশাস্ত্র বা জীবিকাতত্ত্ব” প্রভৃতি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গোপাল ভাঁড় (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৯ (এপ্রিল ১৮৮২)।

এই “রহস্ত-জনক মাসিক পত্র” কিশোরলাল বর্ষগের সম্পাদকতায় ৮ নং তারাতাঁদ দস্তের ঙ্গীট হইতে প্রকাশিত হয়। সামাজিক কুনীতি নিরাকৃত করা ইহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

বার্তাবহ (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)।

“আমরা বার্তাবহ নামক ক্ষুদ্র কলংবরের নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। পাবনা হইতে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

ঋষিতত্ত্ব (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)।

“ঋষিতত্ত্ব। বেদ, পুরাণ তন্ত্র, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষাদি যুক্তি ও আয়ুর্বেদীয় মাসিক পত্র ও সমালোচনা। শ্রীঅন্নদাচরণ সরস্বতী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। চট্টগ্রাম, চন্দ্রশেখর যন্ত্রে মুদ্রিত। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় মূল্য দেড়

যান।...আমরা যত্ন সহকারে ঋণিতন্ত্রের অত্যেক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি। ২।১১। প্রবন্ধ ব্যতীত সমস্তই সারবান ও লেখকের বিজ্ঞা ও জ্ঞানবস্তুর পরিচায়ক।—এরূপ সাময়িক পত্রের দীর্ঘ-জীবন আমরা কাম্যনোবাক্যে প্রার্থনা করি।—‘প্রবাহ,’ আশ্বিন ১২৮২।

দর্পণ (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ (২ জুন ১৮৮২)।

কুমিল্লা হুদু সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত।

ভারতহিতৈষী (পাক্ষিক)। জ্যৈষ্ঠ (৭) ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

“ভারতহিতৈষী নামক একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি বরিশাল হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৪ আষাঢ় ১২৮২।

রামধনু (সাপ্তাহিক)। জুন ১৮৮২।

“আমরা রামধনু নামক একখানি নূতন পত্রিকার কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। নগদ মূল্য এক পয়সা। ইহাতে শিল্প বিজ্ঞানাদির বিষয় লিখিত হইতেছে। বিষয়গুলি উপকারক।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২১ জুলাই ১৮৮৩।

এই সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র “ঢাকা কলেজের লেবরেটরি এগিস্ট্রাণ্ট শ্রীহর্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত।” ইহার ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যার তারিখ—জুন ১৮৮৩।

নবীন (মাসিক)। আষাঢ় ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

সম্পাদক—প্রসন্নকুমার গুহ। ইহা ঢাকা গিরিশম্বর হইতে প্রকাশিত হইত।

স্বদেশ সংস্কারক (মাসিক)। আষাঢ় ১২৮২ (জুলাই ১৮৮২)।

সম্পাদক—হরিমোহন রায়।

প্রতিভা (সাপ্তাহিক)। আষাঢ় (৭) ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

“আগবা প্রতিভা নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতি বৃহস্পতিবার ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৭ শ্রাবণ ১২৮২।

মাসিক সন্দর্ভ। শ্রাবণ ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

“নূতন পুস্তক।—...মাসিক সন্দর্ভ (শ্রাবণ ১২৮২)—শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৬ শ্রাবণ ১২৮২।

প্রতিবাদ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮২ (আগস্ট ১৮৮২)।

সম্পাদক—অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মাল্য (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৮২)।

পরিচালক—মাখনলাল দত্ত।

উষা (মাসিক)। প্রাবণ (৭) ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

“উষা—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন। পাবনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য অগ্নিম বার্ষিক ১০ মাত্র। আমরা ইহার ১ম তিন সংখ্যা পর্যন্ত পাইয়াছি। যে পর্যন্ত দেখা গেল অধিকাংশ প্রবন্ধগুলিরই ভাষা এবং তাব বেশ সুন্দর হইছে।”—‘বামাবোধিনী পত্রিকা,’ কার্তিক, ১২৮২।

সম্পাদক—আরকনাথ অধিকারী।

ভারতবাসী (সাপ্তাহিক)। ভাদ্র ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

“আমরা ভারতবাসী নামধেয় একখানি নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার ২য় সংখ্যা পাইয়াছি। ভারতবাসীর আকার ঠিক বঙ্গবাসীর ছায়া। মূল্য বঙ্গবাসী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৩১ ভাদ্র ১২৮২।

বিক্রমপ (সাপ্তাহিক)। ভাদ্র ১২৮২ (আগস্ট ১৮৮২)।

সম্পাদক—কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল লাইব্রেরি পত্রিকাখানি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—A new journal apparently intended for the exposure of what is considered by the writers to be current Bengali vices, follies, failings etc.

দিল্লীকা লাড্ডু (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮২ (সেপ্টেম্বর ১৮৮২)।

পরিচালক—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সুরভি (সাপ্তাহিক)। ১ আশ্বিন ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

“বিজ্ঞাপন।—আগামি ১লা আশ্বিন শনিবার হইতে ‘সুরভি’ নামে একখানি নূতন বিবিধ বিষয়িণী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করা ‘সুরভি’র উদ্দেশ্য। সকল সংবাদপত্রের ছায়া ইহাতে নিয়মিতরূপে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রস্তাব ও নূতন সংবাদ প্রকাশিত হইবে, এবং তদ্ব্যতীত বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ধর্মনীতি, প্রাদুর্ভূত, রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস, জীবনচরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, উপন্যাস, গল্প, কাব্য, নাটক প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও মনোরঞ্জক ইংরাজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সারাংশ বা সমুদায়ের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবে। অছাড়া বিষয় ব্যতীত ‘সুরভি’র প্রতি সংখ্যায় একটি চিত্রবিনোদকর ইংরাজী উপন্যাসের কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশিত হইবে। ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় মহিলাগণের পক্ষে ‘সুরভি’ পত্রিকা বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তরঞ্জক হইবে এরূপ আশা করা যায়।

আজি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও মুদ্রাসিদ্ধ প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু

মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকার কার্য সম্পাদিত হইবে। ‘সুরভি’ রয়াল আকার ও পেজি দুই ফরমা হইবে।...শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক।—‘বামাবোধিনী পত্রিকা,’ আগষ্ট ১৮৮২।*

‘সুরভি’ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা কিছু কাল পরে ‘পতাকা’র সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘সুরভি ও পতাকা’ নাম ধারণ করে।

বঙ্গবন্ধু (মাসিক)। অক্টোবর ১৮৮২।

সম্পাদক—রেঃ বরদাচরণ ঘোষ। ইহাতে প্রধানতঃ খ্রীষ্টতত্ত্ব আলোচিত হইত।

প্রজাবন্ধু (সাপ্তাহিক)। আশ্বিন ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

এই সুলভ মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র ‘গোন্দলপাড়া (ফরাসিস চন্দননগর) ব্যাস যন্ত্রে’ মুদ্রিত হইত। ইহাতে ফরাসীদিগের অধীনস্থ ভারতের উদারনৈতিক রাজ্যশাসন, পূর্বতন ইতিহাস, আধুনিক অবস্থা প্রকাশিত হয়। ইংরাজদিগের রাজ্যশাসনের তীক্ষ্ণ সমালোচনা থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, জীবনী, ইতিহাস, সরল বিজ্ঞান, গ্রন্থমালোচনা প্রভৃতি অল্পের মধ্যে অতি সরল ও সরস ভাষায় লিখিত হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।*

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন।

ইন্দ্রজাল (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

“(বিজ্ঞাপন)—ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকল্পার পুঁথি। সন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।...ইহাতে বশীকরণ ও দ্রব্যস্তুপ দ্বারা আশ্চর্য আশ্চর্য ক্রিয়াপ্রদর্শনের প্রক্রিয়াসকল লিখিত আছে।...কার্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ। কলিকাতা, নর্থ স্ত্রাবার্ন টালা, ২ নং কার্যালয়।—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ বৈশাখ ১২৯০।

আর্য্যরঞ্জন (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

“আর্য্যরঞ্জন। মাসিক পত্র ও সমালোচন। বরিশাল, সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীদ্বারকানাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ১/১০—আশ্বিন ও কার্তিক।—‘প্রবাহ,’ মাঘ ১২৮২।

জাতীয় সূত্র (পাক্ষিক)। আশ্বিন (১) ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

“আমরা জাতীয় সূত্র নামক একখানি পাক্ষিক পত্রের কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। জাতীয় সূত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৮২।

প্রেমপ্রচারিণী (পাক্ষিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮২ (৫ ডিসেম্বর ১৮৮২)।

“প্রেম প্রচারিণী নামী একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বারাকপুর্ব নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করা এই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য।—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ পৌষ ১২৮২।

সুখসরোজ (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮২ (ডিসেম্বর ১৮৮২)।

“বিজ্ঞাপন।—‘সুখসরোজ’ নামক সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি সম্বলিত মাসিকপত্র গত ডিসেম্বর হইতে প্রকাশিত হইতেছে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১১ মে ১৮৮৩।

উত্তরবাসিনী (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮২ (ডিসেম্বর ১৮৮২)।

সম্পাদক—স্মারিকানাথ মজুমদার।

আর্য্যপ্রতিভা (মাসিক)। অগ্রহায়ণ (৭) ১২৮২ (ইং ১৮৮২)।

“আর্য্যপ্রতিভা। সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীকালীচরণ পাল কর্তৃক প্রকাশিত।... এই ক্ষুদ্রাকার মাসিক পত্রখানি পাঠ করিয়া আমরা খ্রীত হইয়াছি।”—‘প্রবাহ,’ পৌষ ১২৮২।

বঙ্গবন্ধু (মাসিক)। পৌষ ১২৮২ (ডিসেম্বর ১৮৮২)।

রামচন্দ্র রায় এই পত্রিকাখানি শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করিতেন।

সখা (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠয়ারি ১৮৮৩।

প্রমদাচরণ সেন বালক-বালিকাগণের বিবিধ জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত এই সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। সে-যুগে ইহার খুব আদর হইয়াছিল। আড়াই বৎসর কাগজখানি চালাইবার পর ১৮৮৫ সনের ২১এ জুন, ২৭ বৎসর বয়সে, প্রমদাচরণের মৃত্যু হয়। পরবর্তী জুলাই মাস (৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ‘সখা’র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ৪র্থ বর্ষের (ইং ১৮৮৬) ‘সখা’রও সম্পাদক ছিলেন, তাহার পর অন্নদাচরণ সেন পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে ‘সখা’ ভুবনমোহন রায়-পরিচালিত ‘সাধী’র সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘সখা ও সাধী’ নাম ধারণ করে।

যশোহর প্রবাহ (মাসিক)। ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।

“বিজ্ঞাপন।—‘যশোহর প্রবাহ।’ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। আগামৌ ফেব্রুয়ারি মাসে যশোহর বরণডালি গ্রাম হইতে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল সমেত ১২ টাক।—শ্রীশশিভূষণ মোদক। সম্পাদক। যশোহর, ত্রুমুহাটী পোস্ট, বরণডালি গ্রাম।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৫ মাঘ ১২৯০।

ইহাও শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই।

ভারতদর্পণ (সাপ্তাহিক)। ১ ফাল্গুন ১২৮২ (ইং ১৮৮৩)।

“ভারতদর্পণ (সংবাদপত্র) কলিকাতা বামাপুকুর লেন ২০ সংখ্যক ভবনস্থ সরস্বতী যন্ত্রে প্রিন্টেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত ভারতনাথ বিষ্ণু কর্তৃক ৪৬ নং পটুয়াটোলা লেন ভারত দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রতি সোমবারে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যা নগদ মূল্য এক পয়সা।

আমরা এই সুলভ পত্রখানির আবির্ভাবে নিতান্ত প্রীত হইলাম।...এই পত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকাংশে বঙ্গবাসী নামক সংবাদপত্রের ছায়। উভয় পত্রের প্রধান বিভিন্নতা মূল্য। বঙ্গবাসীর মূল্য দুই পয়সা, ভারতদর্পণের মূল্য এক পয়সা।”—‘প্রবাহ,’ চৈত্র ১২৮২।

‘ভারতদর্পণ’ ১লা ফাল্গুন সোমবার প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ১২ই ফাল্গুন তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ ইহার প্রাণ্ডিস্বীকার আছে।

মুকুলমালা (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৮২ (ইং ১৮৮৩)।

“মুকুলমালা।...এই পত্রিকাখানি ফাল্গুন মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে।...ইহাতে পুরাবৃত্ত, পৌরাণিকতত্ত্ব, বৈদিক তথ্য, স্মৃতির কবিতা, সুপাঠ্য উপদ্রাশ, সহজ বিজ্ঞান, এবং বহুবিধ বিষয়ের সমালোচনা প্রভৃতি যথোপযুক্ত লেখক কর্তৃক লিখিত হইবে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১১০।...শ্রীঅমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কার্য্যধ্যক্ষ। কালীকুণ্ডর ঘাট, ফরাশি চন্দ্রনগর।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৬ ফাল্গুন ১২৮২।

বসন্ত সমীরণ (সাপ্তাহিক)। ফাল্গুন ১২৮২ (ইং ১৮৮৩)।

সম্পাদক—এম. এন. বর্মণ। ইহা সালকিয়া হইতে প্রকাশিত হইত।

সঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক)। ৩ বৈশাখ ১২৯০ (১৫ এপ্রিল ১৮৮৩)।

“আমরা সঞ্জীবনী নামী একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানি সুপার রয়েল দুই ফরমা। ইহার মূল্যও অতি শস্তা, দুই পয়সা মাত্র। লেখাও প্রথম সংখ্যায় বেশ হইয়াছে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ বৈশাখ ১২৯০।

‘সঞ্জীবনী’ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন—স্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরঘচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কালীশঙ্কর স্কুল। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩ বৈশাখ ১২৯০। প্রথম দিকে স্বারকানাথই প্রধানতঃ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন।

সময় (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৯০ (এপ্রিল ১৮৮৩)।

“আমরা ‘সময়’ নামক...নূতন সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সময় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সুপার রয়েল চারি পেজ, মূল্য অত্যন্ত খণ্ডের নগদ দুই পয়সা।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ বৈশাখ ১২৯০। ‘সময়’ “রাজনীতি, সাহিত্য, সংবাদ, এবং বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র।”

সারস্বত পত্র (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ (১) ১২৯০ (ইং ১৮৮৩)।

“আমরা সারস্বত পত্র নামক নূতন সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সারস্বত পত্র ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে প্রকাশিত।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ বৈশাখ ১২৯০।

বঙ্গমহিলা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯০ (মে ১৮৮৩)।

সম্পাদক—নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল। পত্রিকার কর্ত্তে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :—

নারীহি জননী পুংসাং নারী ঐক্যচ্যতে যুগৈঃ

তন্মাত্রে মেধে গৃহস্থানাং নারী শিক্ষাপরীক্ষণী।

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—“জ্ঞানের অধিকার বর্জন ও গৌরব ব্যাপন ইহার উদ্দেশ্য। বিস্তীর্ণ জগৎ-সংসার আলোকিত কর ইহার সাধ্যায়ত্ত হউক বা না হউক, বাঙ্গালির অন্তঃপুরে যেখানে অজ্ঞানতিমির চিরবিরাজমান, যেখানে তীব্রকর পণ্ডিতগণের বিতরিত জ্ঞানালোক লক্ষপ্রবেশ হয় না সেই স্থানে থাকিয়া স্বকর্ষ্যসাধন করিবে।”

কিরণ (মাসিক)। বৈশাখ ১২২০ (মে ১৮৮৩)।

ইহা একখানি পঞ্চময় মাসিকপত্র, নান্নার ভারত জুহুৎ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইত। প্রতি পৃষ্ঠের মূল্য ছিল ১০। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহার পরিচালক হিসাবে কালিশচন্দ্র দে'র নাম আছে।

হানিমান (মাসিক)। বৈশাখ ১২২০ (মে ১৮৮৩)।

“সদৃশ-চিকিৎসাবিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র।” সম্পাদক—বসন্তকুমার দত্ত।

হোমিওপ্যাথিক প্রচারক (মাসিক)। বৈশাখ ১২২০ (মে ১৮৮৩)।

সম্পাদক—পূর্ণচন্দ্র সেন।

বৈষয়িক তত্ত্ব (মাসিক)। বৈশাখ ১২২০ (মে ১৮৮৩)।

এই মাসিকপত্র তাহিরপুর দাতব্য-কৃষিকাৰ্য্যালয় হইতে রামপ্রসাদ তালুকদার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বঙ্গবিহারী থা ইহা সম্পাদন করিতেন। পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

“সংক্ষেপে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, সাংসারিক জীবনের জাতব্য বিষয়-কার্য সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আলোচনা ও আলোচনের স্বত্ত্ব এ পত্রিকা প্রকাশ করা যাইতেছে এবং যে যে বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বঙ্গের পার্শ্ববর্তী অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই বিষয়ের প্রতি আমাদের অধিক দৃষ্টি থাকিবে।”

‘বৈষয়িক তত্ত্ব’ কিছু দিন পরে ত্রৈমাসিক পত্রিকায় পরিণত হইয়াছিল।

তরঙ্গিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২২০ (মে ১৮৮৩)।

সম্পাদক—রামসত্য মুখোপাধ্যায়।

জব্যগুণতত্ত্ব (মাসিক)। বৈশাখ ১২২০ (মে ১৮৮৩)।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

নব্যভারত (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

এই সুপরিচিত মাসিক পত্রখানি দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় ১২২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩২৭ সালের ১৮ই আশ্বিন দেবীপ্রসন্নের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র প্রভাতকুমার রায় চৌধুরী ‘নব্যভারত’ের প্রচার অব্যাহত রাখেন। সম্বৎসর-মধ্যে তাঁহার

মৃত্যু হইলে (১২ ভাদ্র ১৩২৮) ১৩২৮ সালের আশ্বিন-কার্তিক যুগ্ম-সংখ্যা হইতে তৎপত্নী কুমলিনী রায় চৌধুরী 'নব্যভারতে'র সম্পাদিকা হন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানি ১৩৩২ সাল (৪৩শ বর্ষ) পর্যন্ত চলিয়া লুপ্ত হয়।

কৌমুদী (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২২০ (মে ১৮৮৩)।

ইহা সম্পাদন করিতেন—হারাগচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

যোগিনী (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২২০ (২৪ মে-১৮৮৩)।

পরিচালক—উমাশঙ্কর বাগচি।

ললনা স্মৃতি (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২২০ (৪ জুন ১৮৮৩)।

পরিচালক—মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহচরী (মাসিক)। আষাঢ় ১২২০ (জুন ১৮৮৩)।

এই সচিত্র পত্রিকাখানি "শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সাধু কর্তৃক ষোড়শীকো ৫ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গল্প হইতে প্রকাশিত।"

কলির নূতন অবতার (পাক্ষিক)। আষাঢ় ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

পরিচালক—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।

সচিত্র বঙ্গীয় রহস্য (পাক্ষিক)। আষাঢ় ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

ইহাতে কেবল গল্প-উপাখ্যানই স্থান পাইত। পরিচালক—ভারকনাথ বিশ্বাস।

পাক-প্রাণালী (মাসিক)। আষাঢ় (৭) ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

সম্পাদক—বিপ্লবদাস মুখোপাধ্যায়।

শক্তি (সাপ্তাহিক)। শ্রাবণ ১২২০ (জুলাই ১৮৮৩)।

ইহা ১২২০ সালের শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত।

ভারতভূমি (সাপ্তাহিক)। ১১ শ্রাবণ ১২২০ (২৬ জুলাই ১৮৮৩)।

"ভারতভূমি—নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র গত ১১ই শ্রাবণ অবধি শাস্তিপুর হইতে বহির্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"—'এডুকেশন গেজেট,' ২৬ শ্রাবণ ১২২০।

হীরাপ্রভা (মাসিক)। শ্রাবণ ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

১২২০, ১২এ আশ্বিনের 'এডুকেশন গেজেটে' অন্নদাপ্রসাদ দাস কর্তৃক প্রকাশিত এই পত্রিকাখানির ১ম ও ২য় সংখ্যার আন্তর্জাতিক আছিল।

দৈনিক বার্তা (প্রাত্যহিক)। ১ আগষ্ট ১৮৮৩।



“বিজ্ঞাপন।—দৈনিক বাস্তা। ১লা আগষ্ট হইতে দৈনিক বাস্তা প্রত্যহ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।...অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাণ্ডল সমেত ১২ টাকা।...শ্রীগিরীজলাভ চৌধুরী। হুগলী।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৩০ আগষ্ট ১৮৮৩।

উদ্বোধন (সাপ্তাহিক)। ভাদ্র ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

“উদ্বোধন—নূতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২২ ভাদ্র ১২২০।

নন্দিকেশ্বর (মাসিক)। ভাদ্র ১২২০ (আগষ্ট ১৮৮৩)।

“নন্দিকেশ্বর সচিত্র রহস্তাস্থক মাসিক পত্র ও ব্যঙ্গ সমালোচন। সত্যচরণ গুপ্ত এণ্ড সন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ডাকমাণ্ডল সমেত ১২ এক টাকা। প্রতি খণ্ড এক আনা। নন্দিকেশ্বরের উপস্থিত ব্যঙ্গের নমুনাগুলি বাজারে অগ্রাহ্য হইবে না। অনেকেই আদর করিয়া ক্রয় করিতে পারেন।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ ভাদ্র ১২২০।

সম্পাদক—সত্যচরণ গুপ্ত।

আলোক (সাপ্তাহিক)। ভাদ্র ১২২০ (আগষ্ট ১৮৮৩)।

“আলোক—সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত, নগদ মূল্য আশ পয়সা। সংবাদপত্র জ্বলন্ত হইতে আব বাকি রহিল না।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৫ ভাদ্র ১২২০।

ব্রাহ্মণ (মাসিক)। ভাদ্র ১২২০ (আগষ্ট ১৮৮৩)।

তেজচন্দ্র বিজ্ঞানন্দের সম্পাদনায় এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ‘এডুকেশন গেজেট’ (৮ ভাদ্র ১২২০) লেখেন :—“আমরা এই আর্থ্যর্ষ প্রচারিকা মাসিক পত্রিকার ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা উপহার প্রাপ্ত হইয়া অগ্রহাতিশয় সহকারে ইহার আয়োজন পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম।”

বালিকা (মাসিক)। ভাদ্র ১২২০ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৩)।

“বালিকা—নূতন মাসিক পত্রিকা। ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। এখানি প্রধানতঃ বালিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত অভিপ্রেত। তরুণবোগী বিষয়গুলিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৫ অগ্রহায়ণ ১২২০।

পত্রিকাখানি অক্ষয়কুমার গুপ্তের সম্পাদনায় ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত। বেঙ্গল লাইব্রেরির ভালিকা-মতে ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩।

আন্দোলন (মাসিক)। ভাদ্র ১২২০ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৩)।

ইহা সম্পাদন করিতেন—নাট্যকার অভূতকৃষ্ণ মিত্র।

—কলিকাতার নিগূঢ় তত্ত্ব (মাসিক)। আশ্বিন ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

পরিচালক—নন্দলাল সরকার।

বদেব চাঁদ (মাসিক)। আশ্বিন ১২২০ (সেপ্টেম্বর ১৮৮৩)।

ইহাও একখানি হাফপ্রধান মাসিকপত্র; পরিচালক—পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।

ভারতবণিক (সাপ্তাহিক)। আশ্বিন ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

“ভারতবণিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। কলিকাতায় নূতন প্রকাশিত।

ইহাতে কেবল ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কীয় প্রবন্ধ ও সংবাদাদি প্রকাশিত হইবে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৯ আশ্বিন ১২২০।

সংসার (সাপ্তাহিক)। আশ্বিন (৭) ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

“সংসার—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, কলিকাতা কালীপুর হইতে নূতন প্রকাশিত। কয় সংখ্যার লেখা ভালই বোধ হইল।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১০ কার্তিক ১২২০।

বঙ্গবাসিনী (সাপ্তাহিক)। কার্তিক ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

ইহা বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, ১৮৮৩ সনের শেষ ভাগে কলিকাতার টালা অঞ্চল হইতে প্রকাশিত হয়। ১২২০, ১২ই আশ্বিন (১৮৮৩, ২৮এ সেপ্টেম্বর) তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ ‘বঙ্গবাসিনী’র এই বিজ্ঞপ্তিটি মুদ্রিত হয় :—

‘বঙ্গবাসিনী

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা

ডাকমাস্তুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সহস্রে ১১০ টাকা, মকসলে ২।০। আকার দুই করমা, ডিমাই এক সিট, উত্তম ছাপা, উত্তম কাগজ। প্রতি মঙ্গলবার প্রাতে প্রকাশিত হইবে, নগদ মূল্য দুই পরসো মাত্র।

লেখিকাগণ।—শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী রায়, সরোজিনী গুপ্ত, মিত্হারিণী দেবী, শিবসুন্দরী দে, কৃষ্ণকামিনী মিত্র, থাকমণি ঘোষ, সৌদামিনী গুপ্ত, আমোদিনী ঘোষ, অম্বুপমা দেবী, কুসুমকামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমোদসুন্দরী দেবী, তরঙ্গিণী ঘোষ।

এই সকল বঙ্গমহিলাগণ কর্তৃক লিখিত বঙ্গবাসিনী আপাদী আশ্বিন [কার্তিক ?] মাস হইতে সাধারণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং দেশীয় বাদশা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বিলাতী ভাষা ভাষা সংবাদপত্র হইতে নানাবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধের সারভাগ উদ্ধৃত ও অমুবাদিত করা হইবে। জ্ঞানী, মানী, ধনী, শিক্ষক, কৃষক, অজ্ঞান, বালক বালিকা, ব্যবসায়ী, স্ত্রী, পুরুষ, সকল শ্রেণীর লোকের জ্ঞান লিখিত এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশসমূহে বামাগণের লিখিত, নানা প্রকার সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকার বিশেষ আদর হইয়া থাকে। তবে বঙ্গ আদর না হইবে কেন? বঙ্গবাসিনীর প্রধান উদ্দেশ্য অধিকৃত

লোকশিক্ষার প্রধান উপায়, আরও ইহাতে কয়েক জন সুশিক্ষিতা রমণী লিখিবেন, নান কারণ বশতঃ তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা হইল না।—শ্রীপদীন্দ্রলাল দাস ঘোষ ▶ বঙ্গবাসিনী কার্যাব্যাহক। কলিকাতা মণ্ডলুবার্ণ টালা, ২ নং বঙ্গবাসিনী কার্যালয়।”

পরবর্তী ১৫ই অগ্রহায়ণ (৩০ নবেম্বর) তারিখে ‘বঙ্গবাসিনী’র ১ম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ‘এডুকেশন গেজেট’ এইরূপ লেখেন :—

“বঙ্গবাসিনী (১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা) সাপ্তাহিক পত্রিকা, জীলোক কর্তৃক বঙ্গবাসিনী-গণের হিতোদ্দেশে সম্পাদিত। কলিকাতা হইতে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জীলোকের লেখা বলিয়া ইহার ভাষাভিগত কোন দোষ নাই। বস্তুতঃ সকল বিষয়েই উত্তম হইয়াছে।”

বাঁটাল পত্রিকা (পাক্ষিক)। কার্তিক ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

“বাঁটাল পত্রিকা; ইহা পাক্ষিক, ইহার ঐর্থ ও ৫ম দুই সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৮ পৌষ ১২২০।

বাল্যবন্ধু (মাসিক)। কার্তিক ১২২০ (অক্টোবর ১৮৮৩)।

সহজ ভাষায় গল্পছলে ছেলেদের খীষ্টতত্ত্ব বুঝাইবার অল্প পাদরি জে. ই. পেনের (Payne) সম্পাদকত্বে এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়।

কৃষিপদ্ধতি (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

“কৃষিপদ্ধতি (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা)—এখানি কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা; বরাহনগর নগর হইতে শ্রীউমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৫ অগ্রহায়ণ ১২২০।

পঞ্চপ্রদীপ (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২২০ (ইং ১৮৮৩)।

“বিজ্ঞাপন।—পঞ্চপ্রদীপ। মাসিক পত্রিকা। মূল্য ডাকমান্ডল সমেত ১৮/০। আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে ডিমাई তিন ফরমা আকারে ‘পঞ্চপ্রদীপ’ প্রকাশিত হইবে। অনেক কৃতবিশ্ব ব্যক্তি ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিবেন। শ্রীচূর্ণাচরণ রায়। ম্যানেজার। ২৭ নং কলেজ স্ট্রীট। পঞ্চপ্রদীপ আপিস, কলিকাতা।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৫ অগ্রহায়ণ ১২২০।

‘পঞ্চপ্রদীপ’ শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই।

চন্দ্রমা (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২২০ (নবেম্বর ১৮৮৩)।

ইহা কলিকাতার গ্রেট ইডেন থ্রেস হইতে প্রকাশিত হইত।

বস্তুবিদ্যা (মাসিক)। পৌষ ১২২০ (ডিসেম্বর ১৮৮৩)।

হরিপদ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ইহা নরগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইত।

—নীহার (মাসিক)। পৌষ ১২২০ (ডিসেম্বর ১৮৮৩)।

“প্রান্তিকীকার।...নীহার (মাসিক সংবাদপত্র) ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য নগদ দুই পয়সা। কলিকাতা শ্রামবাজার নীহার কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১৪ পৌষ ১২২০।

‘এডুকেশন গেজেটে’ “মাসিকপত্র”-রূপে ‘নীহার’র উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহা মূল্যাকর প্রদান; পত্রিকাখানির মূল্য বিবেচনা করিলে ইহাকে “সাপ্তাহিক” বলিয়াই মনে হয়।

মুসলমান (সাপ্তাহিক)। জাম্ময়ারি ১৮৮৪।

“মুসলমান নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এই জাম্ময়ারি মাস হইতে প্রচারিত হইবার একখানি অন্তর্ধানপত্র আমরা দেখিলাম। ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইবে। কেবল মুসলমানদিগের নিমিত্ত কোন সংবাদপত্র আমাদের বাংলায় নাই। প্রস্তাবিত পত্র এই অভাব পূরণের নিমিত্ত প্রচারিত হইতেছে।”—‘এডুকেশন গেজেট,’ ১১ জাম্ময়ারি ১৮৮৪।

‘মুসলমান’ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই।

পাক্ষিক সমালোচক (পাক্ষিক)। ১ম পক্ষ, ফাল্গুন ১২২০ (ইং ১৮৮৪)।

ইহা একখানি “সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন”; হরিচরণ রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

অজুত ইন্দ্রজাল (মাসিক)। ফাল্গুন ১২২০ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪)।

পরিচালক—গিরীজলাল ঘোষ। ইহাতে ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের কথাই আলোচিত হইত।

রত্নসিংহ (মাসিক)। ফাল্গুন ১২২০ (৯ মার্চ ১৮৮৪)।

ইহা কলিকাতার টালা অঞ্চল হইতে রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত।

আমরা ১২৭৫ হইতে ১২৯০ সাল পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রগুলির বিবরণ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশ করিলাম। যতই অসম্পূর্ণ হউক, ভবিষ্যৎ কর্ম্মার পথ সুগম করিবার মানসেই আমি সংগৃহীত উপকরণগুলি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর কিছু কিছু নূতন সংবাদ আমার হস্তগত হইয়াছে। পাঠকগণ এগুলি যথাস্থানে সম্মিষ্ট করিয়া লইলে সুখী হইব।

7603

১। **শুলভ সমাচার**—প্রথম প্রকাশ : ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।—১২৯০ সালের ভাদ্র মাস হইতে ইহা ‘কুশদহ ও ভেরি’র সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘শুলভ সমাচার ও কুশদহ’ নাম ধারণ করে।

২। **মদ না গরল ?**—নামক মাসিকপত্রখানি প্রকৃতপক্ষে ১২৭৮ সালের (১২৭৯ নহে) বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৭১) প্রকাশিত হয়। ভারত-সংস্কার-সভার প্রথম সাধারণিক বিবরণে ইহার উল্লেখ আছে।

৩। **সঙ্গীত সমালোচনী**।—‘ভারত-সংস্কারক’ পত্রে (২৭ কার্তিক ১২৮২) প্রকাশিত সঙ্গীতবিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদি সম্বন্ধে একটি রচনায় এই অংশটি আছে :—“এই সালের [১২৭৯] আশ্বিন মাসে কতিপয় সঙ্গীতজ্ঞের সাহায্যে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় ‘সঙ্গীত সমালোচনী’ নামে একখানি অভিনব সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় এই পত্রিকাখানি ৬ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে।”

৪। **সর্বার্থ সঙ্কলন** (মাসিক)। ১২৭৯ সাল (ইং ১৮৭২)।

ইহাতে ক্রমান্বয়ে কাব্য, নাটক, পুরাণ, বেদ, স্মৃতি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ষড়্দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থসকল বঙ্গানুবাদের সহিত বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইত। ‘সর্বার্থ সঙ্কলন’ বাগবাজার-নিবাসী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কবাদিত ও সংশোধিত। ১২৭৯ সালে ইহার প্রথম আট সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭৯, ১লা শ্রাবণ তারিখের ‘সোমপ্রকাশে’ ইহার ১ম খণ্ডের প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

৫। **মহাপাপ বাল্য বিবাহ**—প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১২৮০।—ঢাকার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই মাসিকপত্র পরিচালন করিতেন।

৬। **প্রমোদিনী**।—ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—আশ্বিন (ফাল্গুন নহে) ১২৮০।

৭। **ভারতদর্পণ প্রকাশিকা**।—ইহা ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। ‘ভারত-সংস্কারক’ (১২ বৈশাখ ১২৮১) প্রকাশ :—“আমরা ভারত দর্পণ প্রকাশিকা নামী একখানি পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা সাধারণের হিতার্থে বিনা মূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে।”

৮। **বীন্দরামী**—প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১২৮২।—১৮৮০ সনের আগষ্ট মাসে ইহা ‘বঙ্গরহস্য The Bengal Punch’ আখ্যা ধারণ করে।

৯। **বালকবন্ধু**—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ‘প্রচারকগণের সভা’য় ১০ বৈশাখ, সোমবার, ১৮০০ শকের অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় :—“বালকদিগের জন্ত বালকবন্ধু নামক পাক্ষিক এবং জীলোকদিগের জন্ত পরিচারিকা (নামক) একখানি মাসিক পত্রিকা

বাহির হইবার প্রস্তাব হইল।* আমরা ৪র্থ সংখ্যা ‘বালকবন্ধু’ দেখিয়াছি; উহার প্রকাশকাল—৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৮০০ শক, বৃহস্পতিবার। প্রথম সংখ্যা ২০ বৈশাখ (২ মে ১৮৭৮) প্রকাশিত হওয়াই সম্ভব। ইহার প্রতি-সংখ্যার মূল্য ছিল এক পয়সা। ‘বালকবন্ধু’ ১৮০৩ শকের ১লা পৌষ (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮১) হইতে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত প্রচারকগণের সত্তার ১৮০৩ শক, ২১এ অগ্রহায়ণ তারিখের কার্যবিবরণে প্রকাশ :—

“২। আগামী উৎসবের মধ্যে আশ্রম, স্কুল, বালকবন্ধু প্রভৃতি পুনরায় করিতে হইবে।...”

৪। বালকবন্ধু পত্রিকা পরিচালনের কমিটির সভ্য শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত, দীননাথ চক্রবর্তী, রাজমোহন বসু হইলেন। বালকবন্ধু মাসিক হইল। ১ম খণ্ড ১লা পৌষে বাহির হইবে।†

মাসিক ‘বালকবন্ধু’ কিছু দিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। ইহার “নূতন প্রকরণ” মাসিক আকারে ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়; প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা।

১০। দিবাকর—‘বীরভূম-বিবরণের’ ৩য় খণ্ডে প্রকাশ :—“বীরভূম হইতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম ‘দিবাকর’ নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ১৮৭৮ খ্রীঃ প্রকাশিত করেন। অল্প দিন পরেই এই পত্রিকা বিলুপ্ত হইয়া যায়।”

১১। আর্য্য-প্রদীপ—প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১২৮৫।—এই মাসিকপত্র ১২৮৭ সালে ‘আর্য্যপ্রভা’ নামে রক্ষণীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

১২। রসিকরাজ : ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—জ্যৈষ্ঠ (বৈশাখ নহে) ১২৮৮।

১৩। বিশ্বাসী : ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—ভাদ্র (শ্রাবণ নহে) ১২৮৮।

১৪। উদাসিনী রাজকন্ডার গুপ্তকথা (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮৮ (ইং ১৮৮১)।

* ‘বিজ্ঞাপন।—উদাসিনী রাজকন্ডার গুপ্তকথা। সন. ১২৮৮ সালের আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।... যদি স্ফলভ মূল্যে উপভ্যাস পাঠের আশ্রম উপভোগ করিতে চাও, তবে উদাসিনী পাঠ কর। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, মায় রাহাধরচ ১৮০/৮।... কার্য্যসম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ। কলিকাতা নর্থ সুবার্বন টালা, ২ নং কার্য্যালয়।’—‘এডুকেশন গেজেট,’ ৮ বৈশাখ ১২৯০।

* ‘প্রচারকগণের সভাব বা শ্রীদরবারের নির্দায়ণ (৫-৮-৭২—৫-১২-১৮৮০),’ ১৩০৭ সাল, পৃ. ৫৮।

† ই. পৃ. ১২৪।

১৫। **হরিতত্ত্বিতরঙ্গিনী**—এই মাসিকপত্রিকা ১২৮৮ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ‘ধর্মতত্ত্বে’ (১ চৈত্র ১৮০৩ শক) প্রকাশ :-
 “আমরা মনমোহনসিংহ হইতে হরিতত্ত্বিতরঙ্গিনী নামে একখানি মাসিক পত্রিকার ৩ খণ্ড ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানি দ্বারা নববিধান প্রচার করাই লিখকের উদ্দেশ্য।”

ভারতীয় সূর্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য

ঐন্দিলীপকুমার বিশ্বাস

ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক যুগে প্রচলিত সূর্যোপাসনার ধারাকে মোটামুটি দুটি পর্বে গণ্য করা চলে। বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত সৌর ধর্ম এর প্রথম বা বৈদিক পর্ব। পরবর্তী কালে (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে) সূর্যপূজার এক নতুন পদ্ধতি পারস্ত থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। উক্ত নব ধারার প্রবর্তক ছিলেন—প্রাচীন পারস্তের ম্যাগি (Magi) পুরোহিত সম্প্রদায়, ভারতীয় ঐতিহ্যে দ্বারা মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বা তার কাছাকাছি সময়ে এই বিদেশী পুরোহিত সম্প্রদায়ের একটি শাখা ভারতে প্রবেশ করে এবং সূর্যপূজার নতুন ঐতিহ্য এদের দ্বারা ভারতে আনীত হয়। বিদেশী-প্রভাব-পুষ্ট সূর্যোপাসনার উদ্ভূত নব রূপ ভারতীয় সৌর ধর্মের দ্বিতীয় পর্ব। আশ্চর্যের বিষয়, সূর্যপূজার এই বহিরাগত নতুন অধ্যায়ের প্রতি ভারতীয় জনমানস বিশেষ কোনও বিরূপতা প্রদর্শন করেনি। স্বর্গীয় অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রাচীন ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে তা লক্ষ্য করে বলেছেন^১ “.....it (অর্থাৎ সূর্যপূজার উদ্ভূত দ্বিতীয় পর্ব) was accepted by the mass of the Hindus as a general worship of the sun and the feelings which it evoked, could not have been different from those which the indigenous worship (অর্থাৎ প্রথম বৈদিক পর্ব) gave rise to.” এ ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, সূর্যপূজার উক্ত দুটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় লোকমানস, কোনও পার্থক্য অনুভব করেনি কেন? দুই অধ্যায়ের মধ্যে সেতুবন্ধ কোনও যোগসূত্র নিশ্চয় ছিল, যার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্যে অন্ততম প্রাধান্য আরাধ্য দেবতা হিসাবে সূর্যের যে স্বরূপ-বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে স্থানে স্থানে সূর্যকে সর্বপ্রকার ব্যাধি-আরোগ্যকারিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের প্রথম ঋগ্বেদ-নির্মলিখিত তিনটি ঋক্ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

“উভয়মি মিত্রমহু আদৌহুভুভাং বিবম্
সুদ্যোগং যম সূর্য্য হরিমাণং চ নার্ষম্ ।
শুক্রেমু মে হরিমাণং রোপণাকান্ত দধসি
অথ হারিত্রবেমু মে হরিমাণং নি দধসি ।

১। Vaishnavism Saivism and Minor Religious Systems (Poona 1928) p. 221.

২। প্রবেশ ১, ৫০, ১১-১২-১৩।



উদগাদয়মাদিত্যো বিবেদম মহসা সহ

দ্বিষংতং মহং রংধরকো অহং দ্বিষতে রবম্ ।^৩

“হে অম্বুকুল দীপ্তিবৃন্ত স্বর্ঘ্য ! অস্ত্র উদয় হইয়া এবং উন্নত আকাশে আরোহণ করি : আমার হৃদরোগ এবং হরিমাণ রোগ নাশ কর । আমি আমার হরিমাণ রোগ শুক শারিকা পক্ষীতে স্থাপন করি ; আমার হরিমাণ রোগ হরিতাল বৃক্ষে স্থাপন করি । এ আদিত্য সমগ্র তেজোরশির সহিত উদিত হইয়াছেন ; তিনি আমার অনিষ্টকারী (রোগ বিনাশ করিয়াছেন ; আমি সেই অনিষ্টকারীর হিংসা করিতেছি না, ” (রমেশচন্দ্র দত্তে অম্বুবাদ, সায়ণের ভাষ্য অম্বুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছি) । এখানে স্বর্ঘ্যকে হৃদরোগ ও হরিমাণ, এই দুই প্রকার ব্যাধির নাশকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে টীকাকার সায়ণের মতে হৃদরোগ দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনও প্রকার রোগ (হৃদরোগ হৃদয়গতম্ অভ্যন্তরং রোগং) এবং হরিমাণ শরীরের স্বাভাবিক কাস্তিবিনাশী কোনও বা ব্যাধি, সম্ভবতঃ কোনও প্রকার চর্মরোগ (হরিমাণং শরীরগতং কাস্তিহরণশীলং বাহ্য রোগং) । উক্ত টীকাকার আরও বলেছেন যে, উক্ত শ্লোক তিনটি একত্রে একটি “ত্রিচ (বা Triplet) রূপে পরিচিত, এবং রোগমুক্তির অম্বু স্বর্ঘ্যের উদ্দেশ্যে ঐ ত্রিচ পাঠ করা বিধেয় । এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাক্ষয় যুনির রোগমুক্তির উপাখ্যান উদাহরণ-স্বরূপ বিবৃত করেছেন । এক বার প্রাক্ষয়ের চর্মরোগ জন্মায় । তিনি উল্লিখিত ত্বচের দ্বারা স্বর্ঘ্যের আরাধনা করে চর্মরোগ হতে মুক্তি পান (অংত্যম্বুচো রোগস্য উপনিষদিত্তি বৃজং চৈতৎ । যস্মাদনেন ত্বচেন স্বগৃদোষশাংতস্মৈ প্রাক্ষয়ঃ স্বর্ঘ্যমম্বোঃ তেন ত্বচেন স্ততঃ স্বর্ঘ্যস্তম্বুধিং রোগান্নিরগময়ৎ তস্মাদিদানীমপি রোগশাংতস্মৈহনেন ত্বচেন স্বর্ঘ্য উপাসনীয়ঃ) দারিদ্র্য, ব্যাধি এবং দুঃখপূর্ণ দূরীকরণার্থে স্বর্ঘ্যের অর্চনার দৃষ্টান্ত স্বর্ঘ্যেদের অস্ত্রত্রেও দেখা যায়”

“যেন স্বর্ঘ্য জ্যোতিষা বাধসে তমো জগচ্চ বিশ্বমুদীয়িষি ভানুর্নাম

তেনাস্বদ্বিষামনিরামনাহতিমপামীবামপ হুঃষঃপ্যং হুব ।^৪

“হে স্বর্ঘ্যদেব ! যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট কর এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তাহার দ্বারা আমাদের সর্বপ্রকার দরিদ্রতা নষ্ট কর । আমাদেরিগের পাপ রোগ ও দুঃখপূর্ণ দূর কর” (রমেশচন্দ্র দত্তকৃত অম্বুবাদ) ।

এই প্রসঙ্গে বৈদিক ধর্মের যুগল দেবতা অশ্বিনের কথা উত্থাপিত করা যেতে পারে । বৈদিক যুগে এঁদের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল, সে বিষয়ে মতভেদ আছে । এক মত অম্বুবায়ী এঁরা স্বর্ঘ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এমন কি, স্বর্ঘ্যের অংশবিশেষ ছিলেন । জনৈক পাশ্চাত্য বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন—“The Asvins may originally have been conceived as finding and restoring or rescuing the vanished light of the sun.” পরবর্তী কালের পৌরাণিক ঐতিহ্যেও স্বর্ঘ্যের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ

৩। ঋগ্বেদ, ১০. ৩৭. ৪।

৪। Macdonell : Vedic Mythology, p. 5.

ল। পৌরাণিক উপাখ্যান অল্পসারে উক্ত দেবতায়ুগল বিশ্বকর্মার কজ্জা সংজ্ঞার গঠে ধার্য ঔরসে জাত হই পুত্র। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যেও এঁরা ছদ্মনে সৌর দেবতারূপে ম্লত হয়েছিলেন, এই মত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বৈদিক হিত্যে অশ্বিনয় যুগল রোগ-চিকিৎসক দেবতারূপে কল্পিত ও বর্ণিত হয়েছেন।^৬ পৌরাণিক ঐতিহ্যেও হৃদয়ের পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের যুগল বৈজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধ। পৌরাণিক সাহিত্যে কোনও কোনও স্থলে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এঁরা এঁদের পিতা ধ্যকর্ষক দেবলোকের ভিষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।^৭

“অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ কৃতৌ পিত্রা মহান্ননা।”

প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিশিল্পেও হৃদয়ের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়।^৮ বিষ্ণুপুরাণে হৃদয়ের মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হৃদয়মূর্তির উত্তম পার্শ্বে শ্বিনয়ের মূর্তি স্থাপিত করা যেতে পারে।^৯

“অশ্বিনৌ চাপি হৃদয়ন্ত পার্শ্বমৌরুত্তমোঃ স্থিতৌ।

অশ্বিনুপাং সমুৎপন্নৌ তেন ভাবশ্বিনৌ সুরৌ।”

১. বাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতীয় (বিশেষতঃ উত্তরভারতীয়) হৃদয়মূর্তিগুলি লক্ষ্য করলে কানও কোনও ক্ষেত্রে হৃদয়ের উত্তম পার্শ্বে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট হৃদয়পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।^{১০} সুতরাং বেদোত্তর ঐতিহ্যের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সৌরদেবতা বলে মেনে নিতে বিশেষ বাধা থাকে না।

অতএব দেখা গেল যে, হৃদ্যকে রোগ-বিমোচকরূপে কল্পনা ও অর্চনা করবার রীতি বৈদিক হৃদ্যোপাসনার অল্পতম বিশেষত্ব ছিল। অশ্বিনয়ের হৃদয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা স্মরণ রাখলে, এ কথাও মানতে হয় যে, কেবল হৃদ্যদেব নন, তৎসংশ্লিষ্ট অল্প কোনও কানও দেবতাও রোগ-বিনাশী চিকিৎসকরূপে বৈদিক যুগে পুজিত হতেন।

প্রাচীন পারস্যের হৃদ্যোপাসক ম্যাগি (Magi) পুরোহিত সম্প্রদায়ের একাংশ ভারতবর্ষে প্রবেশ করবার পর থেকে ভারতীয় সৌরধর্মের দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্বরূপ। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শক-কুশাণ অধিকারের যুগে এঁরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে, এই আগমনকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক।^{১১} সম্ভবতঃ এরও কিছু কাল পূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষ ভাগেই ভারতের মাটিতে এঁরা

* ৬। ঋগ্বেদ ১. ১১৬. ১৬; ৮. ১৮. ৮; ৮. ২২. ১০; ১০. ৩২. ২; অথর্ববেদ ৭. ৫৩. ১; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১. ১. ২. ৩।

৭। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭৮. ২৯ (নিরুপেক্ষ বর্ধমন্ডা সং, পৃ: ১১৮)।

৮। ভবিষ্যুপুরাণ ১. ১২৪. ২০ (বেদাঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃ: ১১০)।

৯। Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography, Vol. I, Pt. II, pp. 314-15.

১০। D. R. Bhandarkar : Foreign Elements in the Hindu Population (Bombay 1910) p. ১২.

প্রথম পদক্ষেপ করেন; কেন না, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে এঁদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় ঐতিহ্যে এই বিদেশী পুরোহিতগণ মগ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। তাঁদের আগমনের স্মৃতির ছাপ স্পষ্টভাবে রয়ে গিয়েছে পৌরাণিক সাহিত্যে, বিশেষতঃ ভবিষ্যপুরাণে। অধুনা প্রচলিত ভবিষ্যপুরাণ ব্রাহ্ম, মধ্যম, প্রতিসর্গ এবং উত্তর, এই চারটি পর্বে বিভক্ত। এগুলির মধ্যে শেষ তিনটি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথম বা ব্রাহ্মপর্ব সম্পর্কে এ কথা খাটে না, এই অংশটি বিশেষজ্ঞদের মতে সুপ্রাচীন। ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা অনুমান করেন যে, এই পর্বটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বেই রচিত হয়েছিল।^{১০} সৌভাগ্যক্রমে ম্যাগি পুরোহিতগণের ভারতে আগমনের কাহিনী ব্রাহ্মপর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং সে কাহিনী যে মূল্যবান, তাতে সন্দেহ নেই। খুঁটিনাটি বাদ দিলে ভবিষ্যপুরাণোক্ত এই বিষয়ক উপাখ্যানটি যা দাঁড়ায়, তা হল এই^{১১} : মগব্রাহ্মণগণ মূলতঃ ছিলেন শাকদ্বীপের অধিবাসী। মিহির গোত্র-সম্বৃত ঋজিহ্ন নামক ঋষির কন্যা নিকুন্তার গর্ভে সূর্যের ঔরসে জলগম্বু বা জরশঙ্গ নামক এক পুত্র জন্মায়। সূর্য ও নিকুন্তার এই পুত্রই মগ সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ। একবার ঐক্ককের পুত্র শাষ হুর্বাশা ও তাঁর পিতা কৃষ্ণ কর্তৃক পর পর প্রদত্ত অভিশাপের ফলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। নারদের নিকট সূর্যমহিমা শ্রবণ করে তিনি সূর্যের আরাধনা করেন ও সূর্যের অমৃতগ্রহে কুষ্ঠব্যাবি হতে আরোগ্য লাভ করেন। উক্ত দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তিনি চন্দ্রভাগা নদীর (বর্তমান পাজ্রাবের ঐ নামের সুপরিচিত নদীর) তীরে একটি সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু মন্দিরে পুরোহিতের কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ এদেশে সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হল না। অবশেষে তিনি সূর্যোপাসক মগ ব্রাহ্মণগণের দেশ শাকদ্বীপে গমন করেন এবং এই বিদেশী সৌর পুরোহিতবর্গের মধ্য হতে আঠারোটি পরিবারকে সঙ্গে করে জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) নিয়ে আসেন। এঁদের দ্বারা তাঁর সূর্যমন্দিরের পৌরোহিত্যকর্ম উপযুক্তভাবে সম্পাদিত হয়। শাষ কর্তৃক ভারতে আনীত মগ পুরোহিতগণ দ্বারকায় ভোজবংশের কল্যাণের মধ্য হতে পত্নী গ্রহণ করে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।^{১২} কৃষ্ণপুত্র শাষের এই উপাখ্যানটি সংক্ষিপ্ত ও দ্রব্য পরিবর্তিত আকারে বরাহ-পুরাণে স্থান পেয়েছে। যদিও সেখানে মগব্রাহ্মণগণের কোনও উল্লেখ নেই, তবু কৃষ্ণের অভিশাপে শাষের দেহে কুষ্ঠরোগ সঞ্চার ও সূর্যোপাসনাস্তে তাঁর রোগমুক্তির যে বিবরণ উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা ভবিষ্যপুরাণোক্ত কাহিনীর অনুরূপ। ভবিষ্যপুরাণের উপরিউক্ত শাষোপাখ্যান যে বরাহপুরাণের শাষোপাখ্যানের মূল, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কেন না,

১০। R. C. Hazra : Studies in the Puranic Records of Hindu Rites and Customs, pp. 170-72.

১১। ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্মপর্ব, অধ্যায় ১২৭ থেকে ১৪২ (বেকটেশ্বর প্রেস সংস্করণ, বোম্বাই, পৃঃ ১১৩৩০০)।

বরাহপুরাণের ঐ উপাখ্যান অংশে দুই বার ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ আছে, যথা—নারদ শাস্ত্রকে বলছেন,

“ভবিষ্যৎপুরাণমিতি তব বাহ্যভবিষ্যতি ।

ব্রহ্মলোকে পঠিষ্যামি ব্রহ্মণোহগ্রে স্বহং সদা ।

স্বমুদ্রমর্ত্যলোকে চ মনোঃ প্রকথয়িষ্যতি ॥”

আবার বরাহ বলছেন

“শাশ্বন্ত সৰ্ব্ব অৰ্ঘ্যেণ রথস্থেন দিবানিশম্ ।

রবিং প্রপচ্ছ বর্ষাদ্বা পুরাণং সূর্য্যভাষিতম্ ।

ভবিষ্যৎপুরাণমিতি ব্যাতকৃৎস্বা পুনর্মবম্ ।

শাশ্বঃ সূর্য্যপ্রতিষ্ঠাঞ্চ কায়মামাস তত্ত্ববিৎ ॥”^{১২}

বিহার প্রদেশস্থ গয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত গোবিন্দপুর নামক স্থানে প্রাপ্ত ১১৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে আমরা শাশ্ব ও মগব্রাহ্মণগণের কাহিনীর উল্লেখ পাই। এর দ্বিতীয় দ্বন্দ্বোকে বলা হয়েছে^{১৩}—

“যেবো জীয়াত্রিলোকীমণিরয়মরুণো যমিবাসেন পুণ্যঃ

শাকদ্বীপসু হৃদ্যমুনিধিবলয়িতো যজ বিপ্রৈ মগাধ্যা ।

বংশন্তজ্ঞে বিজ্ঞানং ত্রিমলিখিততনোষ্ঠাযতঃ স্বাদ্ব (মুক্তঃ)

শাধো যানানিনায় স্বয়মিহ, মহিতান্তে জগত্যাং জয়ন্তি ॥”

“জিভুবনের রত্নস্বরূপ সেই দেব অরুণের জয় হোক, যার নিবাসহেতু হৃদ্যসাগরপরিবেষ্টিত শাকদ্বীপ, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মগ নামে আখ্যাত, পবিত্র হয়েছে। সেখানে ত্রিময়ম্বরের স্বর্গে মুক্ত, স্বয়ং সূর্য্যের অঙ্গ হতে এক বিজ্ঞবংশের উদ্ভব হয়; এঁরা স্বয়ং শাস্বকর্তৃক এখানে আনীত হন। তাঁরা মহান, তাঁরা জগতে সম্মানিত।” স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যপুরাণের পূর্বকথিত শাধোপাখ্যানের এটি একটি অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। গোবিন্দপুর শিলালেখখানি একটি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবংশের প্রশস্তি এবং এর রচয়িতা গঙ্গাধরও সেই বংশজাত। মগব্রাহ্মণগণের শাকদ্বীপ হ’তে ভারতবর্ষে প্রবেশের কাহিনী যে ঐতিহ্যরূপে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত ছিল, এই শিলালিপি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শাকদ্বীপ পুরাণোক্ত সপ্ত দ্বীপের মধ্যে অন্যতম। এর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বহু তর্কবিতর্কের পরে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে, প্রাচীন Scythian বা শকজাতির নাম থেকেই শাকদ্বীপের নাম হয় এবং পুরাণে বর্ণিত শাকদ্বীপ প্রাচীন শকস্থান বা ইরানের অন্তর্গত আধুনিক সিস্তান হতে অস্তিত।^{১৪} উক্ত শাকদ্বীপ যে সূর্য্যপূজার একটি প্রধান

১২। বরাহপুরাণ ১৭৭, ৩৪, ৫০, ৫১ (বিদ্যাপ্রকাশ ইণ্ডিকা সংস্করণ, পৃঃ ২২৪, ২২৬)।

১৩। Epigraphia Indica, vol. II, p. 333.

১৪। H. C. Baychaudhuri : Studies in Indian Antiquities, p. 68.

কেন্দ্র ছিল, নানা পুরাণে নানা ভাবে বার বার তা বলা হয়েছে।^{১৫} মগসম্রাট্যের সেখানকার ব্রাহ্মণ পুরোহিতরূপে মহাভারত পুরাণাদিতে বর্ণিত হয়েছেন।^{১৬} পারস্যের স্বর্ঘ্যোপাসক ম্যাগি পুরোহিত সম্রাট্য এই ভাবে শাকদ্বীপস্থ মগব্রাহ্মণ সম্রাট্যরূপে ভারতীয় ঐতিহ্যে স্থান লাভ করেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পারসীক মতে স্বর্ঘ্যোপাসনা এদেশে প্রবেশ করেছিল। আত্মমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে, কণিক প্রভৃতি কুশাণরাজগণের মুক্তাতে প্রাচীন ইরানের স্বর্ঘ্যদেবতা “মিরিরো” বা “মিহিরের” (মূল “মিথ্র”) নাম ও প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্য করা যায়।^{১৭} সম্ভবতঃ এই সময়েই উক্ত বিদেশী স্বর্ঘ্যদেবতার পূজাপদ্ধতি সহ তাঁর পূজারী মগপুরোহিতগণ ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন। এঁদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতক নাগাদ সমগ্র উত্তরভারতে এই বিদেশী পুরোহিতগণ মারফৎ ইরানীয় পদ্ধতির স্বর্ঘ্যোপাসনা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে জ্যোতিষী বরাহমিহির, কয়েকটি দেবদেবী ও তাদের পূজক বিশিষ্ট কতগুলি সম্রাট্যের উল্লেখ এসঙ্গে স্বর্ঘ্যের উপাসকরূপে মগব্রাহ্মণগণকেই নির্দিষ্ট করেছেন, যথা^{১৮}

“বিকোর্তাগবতাম্-মগাংক সবিকুঃ শস্তোঃ সম্রাট্যজিহ্বাম্

মাতৃগামপি মাতৃমন্তলবিদো বিপ্রাষিচ্ছল্লজ্ঞপঃ।

শাক্যাম্ সর্গবিত্তশ্চ শাস্ত্রমনসো ময়ান্ জিনানাম্ বিহু-

ধে যং দেবরূপাজিতাঃ স্ববিধিনা তৈত্তত্ত ক্কাৰ্য্যা জিহ্মা ॥”

বরাহমিহিরের উক্তি মগসম্রাট্যের প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রমাণ করে।

সম্ভবতঃই ইরানীয় স্বর্ঘ্যোপাসনার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ম্যাগি পুরোহিত সম্রাট্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এসেছিল। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, পারস্যে প্রাচীন কালে কুষ্ঠব্যাদিকে স্বর্ঘ্যের অভিষাপজনিত বলে মনে করা হত এবং এই উৎকট রোগের কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্ত স্বর্ঘ্যদেবকে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হত। এই মনোভাবের খানিকটা আভাস পাওয়া যায় গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাসের সাক্ষ্যে। তাঁর ভাষায়,^{১৯} “A leprous Persian must neither enter the city, nor have

১৫। বিষ্ণুপুরাণ ২, ৪, ৭১ (জীবনন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃ: ২৪২); ব্রহ্মপুরাণ ৩২, ৮০-৮১ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ১৫৬); মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১০৩, ৪১ (নিরুপেক্ষ ধর্মসভা সং, পৃ: ১৪৯) ইত্যাদি।

১৬। মহাভারত (পূর্ণা সং) ৬, ১২, ৩৯, বিষ্ণুপুরাণ ২, ৪, ৬৯-৭০ (জীবনন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃ: ২৪২); ব্রহ্মপুরাণ ২০, ৭১, ৭২, (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ১০৭); অগ্নিপুরাণ ১১২, ১৮-২১ (জীবনন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃ: ৩৪৫); কুর্মপুরাণ ১, ৪৮, ৩৬-৩৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ২১২-১৩); ভবিষ্যুপুরাণ ১, ১৩৯, ৭০-৭৪ (বেকটেশ্বর প্রেস সং, পৃ: ১২৫)।

১৭। Gardner: The Coins of Greek and Scythic Kings of Bactria and India in the British Museum, pp, 131, 134, 141-43, 155 etc.

১৮। বৃহৎসংহিতা ৬০, ১২ (কার্ণ সম্পাদিত সং, পৃ: ৩২৮-২৯)।

১৯। Herodotus I, 138 (Eng. Trans by Below, Vol I, p 142.)

communication with any of his countrymen ; this disease they always think occasioned by some offence committed against the sun.”
 কুষ্ঠরোগ হতে মুক্তি পাওয়ার নিমিত্ত সূর্য্যভূক্তির যে বিধি প্রাচীন পারস্যে প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে ভবিষ্য ও বরাহ পুরাণদ্বয়ের শাখোপাখ্যানের সাধারণভাবে মিল আছে। শাখকেও কুষ্ঠরোগমুক্তির জন্য সূর্য্যার্চনা করতে হয়েছিল, এবং সূর্য্যমন্দিরে পৌরোহিত্য করার নিমিত্ত পারস্য হতে সৌরপুরোহিত আমদানী করতে হয়েছিল। এই বিদেশী পুরোহিতগণ তাদের দেশের প্রথাভাষায়ী সূর্য্যকে রোগবিনাশী, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগবিনাশী-রূপে অর্চনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে এঁদের প্রভাব উত্তরভারতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায়, উক্ত বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমশঃ প্রচার লাভ করে। ফলে ভারতীয় সৌরধর্মের দ্বিতীয় পর্বে সূর্য্যদেবের রোগহর, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগহর স্বরূপের উপর বিশেষ করে জোর দেবার মনোবৃত্তি উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে লক্ষিত হয়।

মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে এবং কোনও কোনও খোদিত লিপিতে এই ক্রতবিস্তারী নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থেকে গিয়েছে। কোথাও সূর্য্য আয়ুর্কর্ষক, কোথাও সাধারণভাবে রোগবিনাশী, কোথাও বা তিনি বিশেষরূপে কুষ্ঠরোগহররূপে বর্ণিত হয়েছেন। সূর্য্য কারও উপর কুপিত হলে, তার সাধারণ ভাবে রোগ জন্মাবে বা বিশেষ ভাবে কুষ্ঠরোগ তাকে আক্রমণ করবে, এইরূপ উক্তিওও অতাব নেই। মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের মুখে যে স্তব্ধ সূর্য্যস্ততি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে বলা হয়েছে যে, সূর্য্যের ভক্ত সর্বপ্রকার রোগ হতে মুক্ত হন এবং দীর্ঘজীবন লাভ করেন^{২০}

“ন ভেদ্যামাপদঃ সন্তি নাথয়ো ব্যাধয়ন্তথা ।

যে ভবানন্তমনসা কুর্কৃত্যর্চনবন্দনম্ ॥

সর্বরোগৈগ্নিরহিতাঃ সর্বপাপবিবর্জিতাঃ ।

স্বচ্ছবভক্তাঃ সুখিনো ভবন্তি চিরজীবিনঃ ॥”

রামায়ণে দেখা যায়, রাম যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের অমিত পরাক্রমে ব্যতিব্যস্ত হয়ে, অগস্ত্যের উপদেশে, সূর্য্যের উদ্দেশ্যে “আদিত্য-হৃদয়” মন্ত্র পাঠ করেন এবং ফলে সূর্য্যের অমুগ্ধ লাভ করে বলশালী হন। উক্ত মন্ত্রে সূর্য্যকে ‘আয়ুর্কর্ষক’ বলে অভিহিত করা হয়েছে^{২১}

“চিন্তাশোকপ্রশমনমায়ুর্কর্ষনমুত্তমম্ ।”

এই জাতীয় বর্ণনা পুরাণগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভবিষ্য ও বরাহপুরাণ-দ্বয়ের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে এবং পরেও সে প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত করা হবে। অছাস্ত পুরাণের মধ্যে এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মপুরাণের সাক্ষ্য সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যোপাসনার কলাফল নিরূপণ প্রসঙ্গে এই পুরাণ বলেছে^{২২}

২০। মহাভারত, ৩, ৩, ৩৫-৩৬।

২১। রামায়ণ ৩, ১০৩, ৫।

২২। ব্রহ্মপুরাণ ২৮, ৪১ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১৩৫)।

“রোগাদিমুচ্যতে রোগী বিভার্ণী লভতে ধনম্ ।”

অত্ৰ এই পুরাণে বলা হয়েছে যে, ভক্তিতরে স্বর্ঘ্যের উপাসনা করলে, উপাসকের বংশে দরিদ্র বা রুগ্ন ব্যক্তি জন্মায় না^{২৩}

“ন কুলে জায়তে তেষাং দরিত্রো ব্যাধিতোহপি বা ।”

স্বর্ঘ্যমহিমা শ্রবণের কলে রোগমুক্তি ঘটে, এ কথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঐ গ্রন্থে অত্ৰ এক স্থানে^{২৪}

“মুচ্যেতাত্ত্বত্বা রোগাচ্ছ্রুত্বমাদিত্যকথাম্ ।

জিজ্ঞাস্তুর্লভতে জ্ঞানং গতিমিষ্টাং তথৈব চ ॥”

অত্ৰ ঐ একই পুরাণে স্বর্ঘ্যবন্দনার মধ্যে স্বর্ঘ্যের উল্লেখ বলা হয়েছে^{২৫}

“নমো নমো রোগবিমোচনায় ।”

আমুর্কর্ষক এবং রোগনাশকরূপে স্বর্ঘ্যের চিত্র মার্কণ্ডেয় পুরাণেও অতি স্পষ্ট। উক্ত পুরাণে (অধ্যায় ১১০) দমের পুত্র রাজা রাজ্যবর্দ্ধনের উপাধ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বর্ঘ্যের বরে এর আয়ু দশ সহস্র বৎসর বৃদ্ধি পায় এবং এর আত্মীয়, বন্ধু, প্রজা, ভৃত্য, সকলেরই আয়ু অমুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়। স্বর্ঘ্য তাঁকে এ অমুগ্রহণ করেন যে, উক্ত দশ সহস্র বৎসরের মধ্যে তিনি কোনও রোগ ভোগ করবেন না^{২৬}

“দশসহস্রবর্ধাণি যথাহং স্থিরবোবনঃ ।

তত্ত্ব প্রসাদাদ্বেবম্ভ জীবিষ্যামি নিরাময়ঃ ॥”

স্বর্ঘ্যকে রোগ-বিমোচকরূপে চিন্তা করবার যে মনোভাবটি ভারতে ক্রমশঃ বহুলপ্রচলিত হচ্ছিল, মার্কণ্ডেয় পুরাণের সমগ্র ১১০তম অধ্যায়টি এক হিসাবে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঐ অধ্যায়ের শেষাংশে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, স্বর্ঘ্যমহিমাশ্রবণকারীর রোগ জন্মায় না^{২৭}

“অরোগী ধনবানাত্যঃ কুলে মহতি ধীমভাম্ ।

জায়তে চ মহাপ্রাজ্ঞো যত্চৈতদ্ধারয়েদ্বৃষঃ ॥”

পদ্মপুরাণে স্বর্ঘ্যের রোগহর স্বরূপের বন্দনার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত আছে। তার মধ্যে যেখানে সাধারণভাবে স্বর্ঘ্যের রোগনাশকত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেই সকল স্থান থেকে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।^{২৮} স্বর্ঘ্যের উপাসনার দ্বারা লোক সর্বরোগ হতে মুক্ত হয়—

“অস্তোপাসনমাত্রেন সর্বরোগাৎ প্রমুচ্যতে ।”

২৩। ব্রহ্মপুরাণ ২২, ৩৩ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ১৩২)।

২৪। ব্রহ্মপুরাণ ৩১, ২০ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ১৪৭)।

২৫। ব্রহ্মপুরাণ ৩৩, ২২ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ১৫২)।

২৬। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১১০, ২২ (নিরপেক্ষ ধর্মসভা সং, পৃ: ১৫৪)।

২৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১১০, ৩৮ (নিরপেক্ষ ধর্মসভা সং, পৃ: ১৫৫)।

২৮। পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৭৭, ১৬, ৬৪, ৬৮, ৭৪, ৮৩; সৃষ্টিখণ্ড, ৭৮, ৭, ২২, ২৮, ৩৬, ৫১, ৫৩-৫৪, ৫৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ৭২২, ৭২৫-২৬, ৭২২-৮০২)।

মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে সূর্য্যের অর্চনা সর্ববিধ রোগের সংহারক—

“যচ্চ তজ্জ কৃতং পাপং যদ্বা সপ্তমী জন্মত্ ।

• তদ্বৈ রোগঞ্চ শোকঞ্চ ভাঙ্করী হন্ত সপ্তমী ॥”

ঐ দিবস সূর্য্যের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদানে ব্যাধির ষাতনা দূর হয়—

“সর্বপাপং ক্ষয়ং ষাতি সপ্তমীকৃতং চ যৎ ।

নরকৈঃ (?) শীড়্যতে তাবদ্রোগৈঃ পাপৈশ্চ দুঃখদৈঃ ॥”

এবং সূর্য্যের প্রসাদে আরোগ্য ও সম্পদ লাভ হয়—

“তবা স্বয়ং সুখং ভোগ্যং লভতে দিবি শাস্ততম্ ।

আরোগ্যং সম্পদং জমী ভাঙ্করন্ত প্রসাদতঃ ॥

মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে বিজয়াব্রতোপলক্ষ্যে (রবিবার ভিন্ন অস্ত্র দিবসে মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথি বিজয়া নামে পরিচিত) সূর্য্যের প্রতি প্রীতিপ্রদ্বায়ুজ্ঞ হয়ে দানাদি করলে, নীরোগ হওয়া যায়—

“অরোগী সুপ্রসন্নাত্মা দত্ত্যজ্ঞেতা প্রতাপবান্ ।

যাবৎ প্রভাসতে ভানুস্তাবৎ পূজ্যতমো হি সঃ ॥”

সূর্য্যের আরাধনার উদ্দেশ্যে রবিবার ব্রত পালনের ফলাফল বর্ণনপ্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থে অস্ত্রজ বলা হয়েছে যে, রবিবারব্রত স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্যদায়ক, মোক্ষপ্রদ ও রোগবিনাশক—

“সর্বকামপ্রদং পুণ্যমৈশ্বর্য্যং রোগনাশনম্ ।

স্বর্গং মোক্ষং পুণ্যং রবের্ষাদে ব্রতং হিতম্ ॥”

সূর্য্য সর্বশক্তিমান্, সর্ববিলম্বনাশন এবং সর্বরোগপ্রশমন—

“সর্বক পরমকৈব সর্ববিলম্বনাশনম্ ।

সর্বরোগপ্রশমনং সর্বার্থপ্রতিসাধকম্ ॥”

সূর্য্যের ষাদশ রূপ, ষাদশাদিত্যের স্তুতিপাঠকারীকে রোগষাতনা ভোগ করতে হয় না—

“য ইদং পঠতে নিত্যং তস্ত পাপং ন বিজতে ।

ন রোগো ন চ দারিদ্র্যং নাবমানো ভবেৎ কচিৎ ॥

... ..

নামাঙ্কতানি সূর্য্যস্ত স্তুতির্ভূ পঠেদগঃ ।

সর্বপাপাচ্চ রোগাচ্চ মুক্তো ষাতি শরাং গতিম্ ॥”

সূর্য্যমঙ্গলপের ও সূর্য্যাবর্জোদক (সূর্য্যোপাসনা বা সৌরব্রতে ব্যবহৃত মঙ্গপূত জল ?) গ্রহণের প্রত্যক্ষ ফল তৎক্ষণাৎ রোগমুক্তি, এক কথায়, সূর্য্যদেব তুষ্ট হলে ব্যাধি ভক্তের কাছে যেসতে পারে না—

“সূর্য্যাবর্জোদকং যন্ত গৃহীত্ব তু ক্রমেণ তু ।

তস্ত প্রশনমাজ্ঞেণ নরো রোগাং প্রমুচ্যতে ॥

... ..

কটুতৈলসমায়ুক্তং নন্তে পামে চ হাপয়েৎ ।

সূর্য্যাবর্জজলং পুজ় সর্বরোগাধিমুচ্যতে ॥

মূলমন্ত্রস্ত জগৎব্যঃ সন্ধ্যায়ং হোমকর্ষ্মহ ।

জপ্যমানে তু নস্তত্তি রোগাঃ ক্লেশগ্রাস্তথা ।

... ..

শরীরারোগ্যকৃৎসেব ধনমুদ্বিষশঙ্কয়ঃ ।

জায়তে নাত্র সন্দেহো যন্ত তুস্তেদ্বিবাকরঃ ।”

ঋগ্বেদপুরাণের মাহেশ্বর খণ্ডে দেখা যায়, হৃদ্য স্বয়ং নারদকে বলছেন যে, তাঁর (হৃদ্যের) প্রতি ভক্তি থাকিলে এবং তাঁর দর্শন লাভ করিলে, তাঁর উপাসকগণের ব্যাধি দারিদ্র্য ইত্যাদি নষ্ট হয় এবং তাঁর নাম জপের ফলস্বরূপ তাঁরা সর্ববিধ রোগ হতে মুক্ত হয়ে শতায়ু হ’ন^{২২}

“দর্শনাত্মম ভক্ত্যা চ মাতো ব্যাধিদারিত্র্যরোঃ ।

প্রণামাং স্বর্গমাপ্নোত্তি ঋত্বা মোক্ষং চ নিত্যশঃ ।

... ..

তবেদ্বর্ষশতায়ুশ্চ সর্বরোগবিবাক্রিতঃ ।

যন্তি যং শৃণুয়ামিত্যং পঠেদ্বা প্রযতঃ শুচিঃ ॥”

মৎস্তপুরাণে দেখতে পাওয়া যায়, শিবের মুখ দিয়ে কতগুলি সৌরব্রতের ব্যাখ্যান দেওয়ানো হয়েছে। সুরপক্ষের সপ্তমী তিথি (বিশেষতঃ মাঘ মাসের) পৌরাণিক সৌর বর্ষের একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ দিন, এবং ঐ তিথিতে হৃদ্যকে নানানভাবে অর্চনা করবার প্রয়োজনীয়তা ও তজ্জনিত গুণের কথা শাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। মৎস্তপুরাণে বর্ণিত কল্যাণ-সপ্তমী, বিশোক-সপ্তমী, ফল-সপ্তমী, শর্করা-সপ্তমী, কমল-সপ্তমী, মন্দার-সপ্তমী, শুভ-সপ্তমী প্রভৃতি ব্রত, উক্ত পুণ্য সপ্তমী তিথিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, এগুলির মধ্যে প্রথম চারটির এবং শেষ ব্রতটির ক্ষেত্রে উক্ত পুরাণে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এই সকল সৌরব্রত পালন করলে সর্বপ্রকার রোগের কবল থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কেবলমাত্র কমল-সপ্তমী এবং মন্দার-সপ্তমী, এই দুটি অমুষ্ঠানের বেলায়, উক্ত প্রকার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু অপর পাঁচটির সাক্ষ্যই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।^{২৩} অপেক্ষাকৃত অবাচীন পুরাণগ্রন্থ বৃহদ্রথপুরাণেও (রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দী) হৃদ্যদেবের রোগহর স্বরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পুরাণকারের দ্বারা ভূরসগ্রাহক গ্রন্থ হৃদ্যের নামগুলি জপ করলে ব্যাধি প্রশমিত হয়^{২৪}

“ভূরসগ্রাহকশ্চেতি স্বর্য়ানামনতং পরম ।

সর্বজ্বরপ্রশমনং সর্বব্যাধিমহৌষধম্ ॥”

২২। ঋগ্বেদপুরাণ—মাহেশ্বর খণ্ড, ২, ৪৪, ৩৭-৪০ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪৬৬-৬৭)।

২৩। মৎস্তপুরাণ—৭৩, ১৮; ৭৪, ১০; ৭৫, ১৩; ৭৬, ১৫; ৭৯, ১ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৪)।

২৪। বৃহদ্রথপুরাণ—উত্তর খণ্ড, ১১, ১৬ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩২৬)।

এ যাবৎ মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি থেকে যে সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে সূর্য্য সাধারণভাবে রোগ-হররূপে বর্ণিত হয়েছেন। কিন্তু তা ছাড়াও প্রাচীন পারস্তে যে ভাব রোগকে, বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগকে, সূর্য্যের অভিশাপজনিত বলে মনে করা হত, সেই জাতীয় মনোভাবের সূচক উক্তিও কোনও কোনও পু্রাণে দেখতে পাওয়া যায়। বামনপুরাণে বলা হয়েছে, সূর্য্যদেবের কোপে কুলনাশ এবং দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়^{৩২}

“হুশিতঃ কুলনাশায় দেহরোগবিরুদ্ধয়ে।

ভাহুর্ধে যততে তচ্চ নরস্ত কণমাচয়।”

মৎস্ত, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে, সূর্য্যমূর্ত্তি নির্মাণকালে শিল্পীকে মূর্ত্তির পদদ্বয় গঠন করতে নিষেধ করা হয়েছে (সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় জাহ্নু পর্য্যন্ত পাঙ্কজাধারা আচ্ছাদিত করবার যে রীতি পারসীক মণ্ডপুত্রোহিতগণের প্রভাবে উত্তরভারতে প্রচলিত হয়েছিল, উক্ত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তারই ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়)। এই নিষেধবাক্য লঙ্ঘন করলে মহাপাপ হবে, সূর্য্যদেব ক্রুদ্ধ হবেন এবং কলে শিল্পীর কুষ্ঠব্যাধি জন্মাবে বলে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে^{৩৩}

“যঃ করোতি ন পাপিষ্ঠাং পতিমাপ্নোতি নিদিতাম্।

কুষ্ঠরোগমবাপ্নোতি লোকেহস্মিন্ হৃৎপংসুতঃ।”

কুষ্ঠরোগের আরোগ্যকারিরূপে সূর্য্যের উল্লেখ এবং স্বভিও পৌরাণিক সাহিত্যে প্রচুর দৃষ্ট হয়। ভবিষ্য ও বরাহ পুরাণদ্বয়ে কথিত শাঘোপাখ্যান এই প্রসঙ্গে পুনরায় এবং সর্ব্বাঙ্গে স্মরণীয়। সূর্য্যের প্রসাদেই স্থপিত কুষ্ঠব্যাধির কবল থেকে শাঘ মুক্তিলাভ করেন, উভয় গ্রন্থেই স্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে। হরিবংশে ও অশ্ব কোনও কোনও পুরাণে সূর্য্য ও তাঁর পত্নী বিশ্বকর্মা কঙ্কা সংজ্ঞার পুত্র যম সম্পর্কে যে কাহিনীটি পাওয়া যায়, তার মধ্যেও সূর্য্যের কুষ্ঠরোগ আরাম করবার ক্ষমতার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে বলে মনে হয়। এই কাহিনী অল্পসারে, একদিন যম তাঁর বিমাতা ছান্নার দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে পদাঘাত করতে উদ্রত হন। তখন ছান্না তাঁর সপত্নীপুত্রকে এই মর্মে অভিশাপ দেন যে, তাঁর (যমের) পদদ্বয় পুঁষ-শোণিতমুক্ত এবং ক্রিমিকীট কর্তৃক ভক্ষিত হবে। যম ভীত হয়ে পিতা সূর্য্যের নিকটে গেলেন। সূর্য্য যদিও পুত্রের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে তাঁকে শাপমুক্ত করতে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন, তথাপি তিনি তাঁকে রোগপ্রশমনের উপায় নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর নির্দিষ্ট উপায়েই যমের চরণ রোগমুক্ত হয়েছিল। বিভিন্ন পুরাণে এই ঘটনার যে বর্ণনা আছে, তাতে সামান্য খুঁটিনাটি পার্থক্য থাকলেও, মূল ঘটনার বিবরণে বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। তবে মৎস্ত, পদ্ম প্রভৃতি দুই একটি পুরাণে আমরা সূর্য্য-নির্দিষ্ট রোগ-প্রভীকার পন্থার বিস্তারিত চিত্র পাই। উক্ত গ্রন্থগুলি অল্পসারে সূর্য্য তাঁর শাপগ্রস্ত

৩২। বামনপুরাণ ১৫, ১২০ (বঙ্গবাসী:সং, পৃ: ৭১)।

৩৩। মৎস্তপুরাণ ১১, ৩২ (জীবনানন্দ বিভাসানন্দকৃত সং, পৃ: ৩৯); পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৮, ৫২ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ৩২)।

পুত্রকে একটি কুকবাকু পক্ষী দান করেন এবং বলেন যে, উক্ত পক্ষী রোগাক্রান্ত চরণের ক্রিমিসকল ভক্ষণ করবে এবং পুঁষ-রক্তও অপসারিত করবে^{৩৪}।

“কুকবাকুর্ময়া দত্তো যঃ ক্রিমীন্ ভক্ষয়িষ্যতি ।

ক্লেদকং রুধিরকৈব বৎসায়মপনেচ্ছতি ॥”

লিঙ্গপুরাণে উক্ত কাহিনী প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, শিবামুগ্ধে যমের শাপমুক্তি ঘটে—সূর্য্যামুগ্ধে নয়।^{৩৫} কিন্তু লিঙ্গপুরাণ সাম্প্রদায়িক শৈবগ্রন্থ, শিবের মহিমা প্রচার এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। পুতরাং এর ঐ জাতীয় সাক্ষ্য আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বলা বাহুল্য, অস্ফাচ্ছ পুরাণের সমবেত সাক্ষ্যের নিকট লিঙ্গপুরাণের একক সাম্প্রদায়িক মত নিতান্ত মূল্যহীন। শৈবধর্মের জয়গান করবার জন্তই এক্ষেত্রে সূর্য্যের নাম কেটে শিবের নাম বসানো হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। যদিও পুরাণে বর্ণিত যমের রোগমুক্তির উপাখ্যানে কুত্রাপি রোগের নামোল্লেখ করা হয়নি, তথাপি রোগের কাহিনী ও পুঁষ, রক্ত ক্রিমি ইত্যাদির বর্ণনা থেকে বুঝতে দেবী হয় না যে, খুব সম্ভবতঃ উক্ত ব্যাধি কুষ্ঠ ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের (বৃহদ্রত্নপুরাণের মত অপেক্ষাকৃত অর্কাটীন গ্রন্থ, রচনাকাল ঐয়োদশ বা চতুর্দশ খ্রীষ্টীয় শতক) মালী জুমালাব উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। সূর্য্যের কোপে মালী এবং জুমালা নামক দৈত্যদ্বয় ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং তাদের সর্বদা গলিত ও হৃগ্নকৃতযুক্ত হয়। অবশেষে ব্রহ্মার উপদেশে তারা স্তবের দ্বারা সূর্য্যকে ভূষ্ট করে সূর্য্যের প্রসাদে ব্যাধিমুক্ত হয়। ব্যাধির বর্ণনা থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, এক্ষেত্রেও কুষ্ঠব্যাধির কথাই বলা হয়েছে। উক্ত পুরাণে এই উপাখ্যানপ্রসঙ্গে যে সূর্য্যস্তবের অবতারণা করা হয়েছে, তার মধ্যে সূর্য্যকে স্পষ্ট ভাষায় কুষ্ঠরোগহর বলে বর্ণনা করা হয়েছে^{৩৬}।

“সিদ্ধিশ্রুতং সিদ্ধেশং সিদ্ধামং পরমং শুক্লম্ ।

সুবরাজমিতি প্রোক্তং শুভাদ্ শুভতরং পরম্ ॥

ত্রিসদ্যং যঃ পঠেদ্রিত্যং সর্বব্যাদেঃ প্রমুচ্যতে ॥

আদ্যং কুষ্ঠকং দারিদ্র্যং রোগঃ শোকো ভয়ং কলিঃ ।

তস্ম নশ্চতি বিবেশ জীসূর্য্যরূপয়া ধ্রুবম্ ॥

মহাকুঞ্জী চ গলিতো চক্ষুর্হানো মহাব্রণী ।

যক্ষ্মাশ্বেত্তো মহাজ্বলী নানাব্যাদিহুতোহপি বা ।

মাসং কৃদ্ধা হবিজ্জায়ং শ্রদ্ধা চ মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥...”

৩৪। মৎস্কপুরাণ ১১, ১২-১৭ (জীবানন্দ বিজ্ঞানাগরকৃত সং, পৃঃ ৩৭-৩৮), পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড : ৮, ৫২ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩১); বায়ুপুরাণ ৮৪, ৩১ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫১০), ব্রহ্মপুরাণ ৬, ২৯-৩০ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩৪); হরিবংশ ১, ৯, ৩১-৩২ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২৭), ইত্যাদি।

৩৫। লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গবাসী সং) ১, ৬৫, ১-২০।

৩৬। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—গণেশখণ্ড, ১৮, ১৯-২৩; পৰ্ব্বশখণ্ড, ১৯, ৪৩-৪৫ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২৩৯, ২৪১)।

ঈশ্বরপূজার অন্তর্গত সৃষ্টিধর্মের উনাব্বিধিতম অধ্যায়ে আমরা মধ্যদেশের সম্রাট ভজ্জেশ্বরের ঈশ্বরোপাস্ত হবার কাহিনী পাই। তাঁর বাম হাতে খেতকুষ্ঠ ব্যাধি হয়েছিল। তখন ঈশ্বরপূজা তাঁকে বলেন যে, স্বর্ষ্যের অমৃতগ্রহ ভিন্ন ঈ ব্যাধি প্রশমনের বিত্তীয় উপায় নাই। তাঁদের নির্দেশ অনুসারে সম্রাট ভজ্জেশ্বর এক বৎসর কাল স্বর্ষ্যের আরাধনা করেন। এবং স্বর্ষ্যের প্রসাদে খেতকুষ্ঠ ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পান।^{৩১} উক্ত সমগ্র অধ্যায়টি ধর্মাদেশের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সপক্ষে একটি চমৎকার প্রমাণ। স্বর্ষ্যপূজার মাহেশ্বর খণ্ডে দ্বাদশতম নামক স্বর্ষ্যমূর্তির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ভক্ত কমঠের মুখে যে স্বর্ষ্যমূর্তি দেওয়া হয়েছে, সন্ধানও অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় স্বর্ষ্যের কুষ্ঠরোগহরত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে^{৩২}

“ব্যাধিপ্রসং কুষ্ঠরোগাভিহৃতং

ভয়দ্রাণং শীর্ণদেহং বিসংজ্ঞম্।

মাতা পিতা বান্ধবাঃ সন্ত্যজন্তি

সর্বৈশ্চ্যুতং পাসি কোহন্তি যদন্তঃ।”

পৌরাণিক সাহিত্যের বাইরে কুষ্ঠ-আরামকারিরূপে স্বর্ষ্যকে অর্চনা করবার বিধির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় কবি ময়ূর-বচিৎ “স্বর্ষ্যশতক” কাব্যে। ময়ূর পুষ্পভূতি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তিনি উক্ত কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য-রচনার পশ্চাতে যে কিংবদন্তী আছে, তা বর্তমান আলোচনাঙ্গসঙ্গে অন্তর্গত। শোনা যায় যে, কবি ময়ূর কোনও সময়ে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন এবং রোগমুক্তির নিমিত্ত স্বর্ষ্যের বন্দনা করে “স্বর্ষ্যশতক” কাব্যখানি রচনা করেন। ফলে তিনি রোগমুক্ত হন। আশ্চর্য্যকর মন্ত্র তাঁর “কাব্যপ্রকাশ” গ্রন্থে এই কিংবদন্তীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। কাব্যচর্চার প্রয়োজনগুলির আলোচনাঙ্গসঙ্গে তিনি ষষ্ঠ অর্থ ইত্যাদির সহিত অনর্থনিবারণের (অর্থাত্ রোগাদি বিপদ হতে মুক্তি) প্রসঙ্গও উত্থাপিত করেছেন এবং সেই সূত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ কবি ময়ূর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীর কথা বলেছেন (আদিত্যাদেবর্ষয়াদীনামিবানর্থ-নিবারণম্)।^{৩৩} এই কিংবদন্তীর সত্যাসত্য যাই হোক না কেন, ময়ূরপ্রণীত “স্বর্ষ্যশতক” কাব্যে অন্ততঃ একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যেখানে সম্ভবতঃ স্বর্ষ্যকে কুষ্ঠরোগহররূপে বর্ণনা করা হয়েছে^{৩৪}

“শীর্ণদ্রাণাভিহিতাশীর্ণং ত্রিভিঃপদৈর্নৈর্ধর্যাব্যক্তধোয়ান্

দীর্ঘদ্রাতানবোদৈঃ পুনরপি খটয়তেতু কুষ্ঠাধরম্ যঃ।

৩১। স্বর্ষ্যপূজা—সৃষ্টিধর্ম, অধ্যায় ৭২ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ৮০৩-০৫)।

৩২। স্বর্ষ্যপূজা—মাহেশ্বরখণ্ড, ২, ৫১, ৭১ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ৫১৩)।

৩৩। কাব্যপ্রকাশ (পুণা সং, প্রথম উদ্ভাস) পৃ: ৮, এই অংশের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অধ্যাপক ঐচিৎসাহরন চক্রবর্তী।

৩৪। স্বর্ষ্যশতক-শ্লোক ৩ (The Sanskrit Poems of Mayura, edited by G. P. Quackenbos, New York 1917, p 115)

খ। মহাভারতের বনপর্বে প্রদত্ত সূর্য্যের অষ্টোত্তরশতনামের তালিকায়, তাঁর অষ্টতম নাম পাওয়া যায় “ধনুস্তরী” ; ঋন্দপুরাণের অন্তর্গত আর একটি নামের তালিকায় সূর্য্যের কয়েকটি নাম “ভিষগুবর” “সঞ্জীবন” এবং “আরোগ্য” ; বৃহদ্রথপুরাণস্থ অল্পরূপ একটি তালিকায় সূর্য্যের অষ্টতম নাম “রোগহা”।^{৪২} নামগুলির মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে, তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অর্থনীয়।

সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনার ঐতিহ্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপে অতি মূল্যবান ও সুস্পষ্টভাবে রক্ষিত ও প্রচারিত হয়ে এসেছে। কালক্রমে এই মনোভাবের প্রসার এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, দেবগণের মধ্যে সূর্য্যকে বিশেষভাবে আরোগ্যের দেবতা হিসাবে বর্ণনার রীতিও প্রচলিত হয়েছিল। মৎস্যপুরাণের একটি সুপরিচিত শ্লোকে বলা হয়েছে, ‘সূর্য্যের নিকট কাম্য আরোগ্য ; অগ্নির নিকট কাম্য ধন ; শিবের নিকট কাম্য জ্ঞান এবং বিষ্ণুর নিকট কাম্য মুক্তি’^{৪৩}—

“আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেনমিচ্ছং হতাশনাং।

ঈশ্বরং জ্ঞানমিচ্ছং মোক্ষমিচ্ছজ্ঞানার্থনাং।”

বিভিন্ন দেবতাকে আরাধনা করবার এই বিশিষ্ট মনোভাবগুলি যে ক্রমশঃ ভারতীয় সমাজে কত গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্মৃতিকার রঘুনন্দন (খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) তাঁর রচনায় মৎস্যপুরাণ থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে সমর্থন করেছেন।^{৪৪} শ্রুতিশাস্ত্রের প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, হেমাদ্রি তাঁর সুবিখ্যাত “চতুর্ভূগচিন্তামণি” গ্রন্থের ব্রতখণ্ডে বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থ থেকে যে সকল সৌর ব্রতের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন, সেগুলির অধিকাংশের পালনে যে রোগমুক্তি ও আয়ুঃবৃদ্ধি ঘটবে, এ কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ আমরা নৃসিংহপুরাণোক্ত “সৌরনন্দব্রত,” ভবিষ্যপুরাণোক্ত “আদিত্যবারে নন্দাবিধি” ও “দিবাকর ব্রত,” ঋন্দপুরাণোক্ত “আশাদিত্যব্রত,” মৎস্যপুরাণোক্ত “সূর্য্যনন্দব্রত,” ভবিষ্যোত্তর পুরাণোক্ত “রোগহর-বিধি,” সৌরধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত “সূর্য্যব্রত” প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি। হেমাদ্রির সংকলনে এগুলির বিস্তারিত বর্ণনা আছে।^{৪৫} অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই প্রসঙ্গে স্মৃতিকার গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্যের “বর্ষক্রিয়াকৌমুদী” (রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের

৪২। মহাভারত—৩, ৩, ২৫; ঋন্দপুরাণ—১, ২, ৪৩, ১২-২৭ (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ৪৬৫-৬৬); বৃহদ্রথপুরাণ ৩, ১১, (বঙ্গবাসী সং, পৃ: ৩২৬)।

৪৩। মৎস্যপুরাণ ৬৭, ৪১ (জীবনানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃ: ২৬৭); এই প্রচলিত শ্লোকটির অতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্ত হুগা সেনগুপ্ত। পরে মৎস্যপুরাণে আমি সেটি খুঁজে পেয়েছি।

৪৪। রঘুনন্দন—একাদশীতত্ত্ব (অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি—শ্রীমামপুর সং, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩২)। রঘুনন্দনপ্রদত্ত এবং লোকপ্রসিদ্ধ দ্বিতীয় পট্টভিত্তির পাঠ প্রায়শ্চৈ “জ্ঞানং চ শকরাদিচ্ছং...”

৪৫। চতুর্ভূগচিন্তামণি (বিদ্রিওথকা ইতিহাস সং) দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, পৃ: ৫২১, ৫২৩, ৫২৭, ৫৩২, ৫৩৬ ৫৪০, ৫৫৬, ইত্যাদি।

প্রথমার্দ্ধ) এবং রঘুনন্দনের “তিথিতত্ত্ব” গ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গোবিন্দানন্দ তাঁর গ্রন্থে মিত্রসপ্তমী, বিজয়াসপ্তমী, আরোগ্যসপ্তমী প্রভৃতি কয়েকটি সৌরব্রতের উল্লেখ করেছেন। সৌরব্রতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিকে কেন্দ্র করেই এই ব্রতগুলির সৃষ্টি। আরোগ্যসপ্তমীর বর্ণনায় দেখা যায়, এই ব্রতপালনের অস্তুতম ফল রোগমুক্তি।^{৪০} রঘুনন্দন তাঁর “তিথিতত্ত্ব” গ্রন্থে (রচনাকাল বোধশ্রীষ্টীয় শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) সপ্তমী তিথির আলোচনা প্রসঙ্গে বিজয়া-সপ্তমী আরোগ্যব্রত, বিধানসপ্তমী প্রভৃতি সৌরব্রতের উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, সৌরব্রতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ মাঘ মাসের সপ্তমী তিথি উপলক্ষ্যেই এগুলিও পালনীয়। এর মধ্যে আরোগ্যব্রত পালনে যে রোগমুক্তি ঘটে, রঘুনন্দন সে সম্পর্কে পৌরাণিক নজির ত উদ্ধৃত করেছেনই, স্বয়ং স্পষ্ট ভাষায় সেই মত প্রকাশ করেছেন (রবিশ্চ বিষ্ণুরপত্নী পূজাকালে ঘোষঃ অভিলিপে তু তত্ত্বিধাবিকৃত্য। আরভ্যেতি ঐহিকারোগ্যধনধাচ্চ-পারলৌকিকশুভস্থানলাভকামঃ)।^{৪১} যে নিবন্ধকারগণের মতবাদ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, আমাদের মূল বক্তব্যের স্বপক্ষে তাঁদের সাক্ষ্য যে যথেষ্ট মূল্যবান, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

স্বর্ধ্যকে রোগহররূপে কল্পনা ও আরাধনা করবার অভ্যাসের ব্যাপক প্রচলনের কিছু আভাস প্রাচীন ভারতের কোনও কোনও খোদিত লিপিতেও পাওয়া যায়। ৪৬৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ সত্রাটী ক্ষ্মদগুপ্তের ইন্দোর তাম্রশাসনে স্বর্ধ্যের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, “রোগ এবং মানসিক উত্তেজনার দ্বারা পীড়িত লোকে তাঁকে (স্বর্ধ্যকে) আশ্রয় করে চেতনা লাভ করে থাকে” (যং লোকো বহুরোগবেগবিবশঃ সংশ্রিত্য চেতোলভঃ...)।^{৪২} বাংলা দেশের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাইরহাট্টা নামক স্থানে প্রাপ্ত স্বর্ধ্যমূর্তির পাদপীঠে খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকের অক্ষরে খোদিত লিপিতে স্বর্ধ্যকে বলা হয়েছে, “সমস্ত-রোগানাং হর্তা” (সমস্ত রোগের নাশক)।^{৪৩} পূর্বোক্ত খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের গোবিন্দপুর শিলালিপিতে শাঙ্কর্যুগ মগব্রাহ্মণগণকে ভারতবর্ষে আনয়ন ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। শাঙ্কর্যুর রোগমুক্তির কাহিনীর উল্লেখ অবশ্য ঐ শিলালিপিতে নেই, কিন্তু এমন অস্বাভাবিক মনে হওয়া হবে না, উক্ত শিলালিপির লেখক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ কবি গঙ্গাধর শাঙ্কোপাধ্যায়ের সেই অংশের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

আলোচনার দ্বারা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে অন্ততঃ বোধশ্রীষ্ট শতক (গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দনের কাল) পর্যন্ত উত্তরভারতে মগ বা

৪০। বর্ধক্সিকার্কোমুদী (বিশিষ্টক ইতিহাস) পৃঃ ৫০১-৫০২।

৪১। তিথিতত্ত্ব (অষ্টাবিশিষ্টস্থানি, —ঐরামপুর সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২)।

৪২। Fleet : Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, pp. 70-71

৪৩। History of Bengal (Dacca University), Vol. (p. 456)

শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের প্রভাবে সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। এ কথা বললে বোধ করি অশ্রয় হবে না যে, উক্ত বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় সৌরধর্মের বৈদিক ও তৎপরবর্তী পর্বের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করেছিল। বৈদিক আর্ধ্যগণ সূর্য্যকে রোগহররূপে কল্পনা করেছিলেন। বিদেশী মগ সৌরপুরোহিতবৃন্দও সূর্য্যকে আরোগ্যকারী এবং বিশেষতঃ কুষ্ঠরোগনাশকরূপে পূজা করবার ঐতিহ্য সঙ্গে করে ভারতে নিয়ে আসেন। বৈদিক যুগ থেকে সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনায় অভ্যস্ত ভারতীয়গণ উক্ত বিদেশী ঐতিহ্যের মধ্যে তাদের নিজস্ব সৌরধর্মের অন্ততম পরিচিত রূপই দেখতে পেয়েছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণে তারা সূর্য্যপূজার এই নবাগত বিদেশী পর্বের প্রতি কোনও প্রকার বিরূপতা প্রদর্শন করেনি। অপর পক্ষে ইরাণীয় সৌর-পুরোহিতগণের পক্ষেও তাঁদের নূতন কর্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সংস্কারকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। বৈদিক সৌরধর্মে সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনার প্রচলন থাকায়—বৈদিক সূর্য্যপূজার এই দিকটির সঙ্গে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সৌরধর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন, এবং নিজেদের মতবাদকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে সম্ভবতঃ বৈদিক সৌরধর্মেরই দ্বারা হিসাবে প্রচার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারতের সর্বত্র সূর্য্যোপাসনার এই বৈশিষ্ট্যটির (অর্থাৎ সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনার) উপর জোর দেবার ধুম পড়ে যায়। ক্রমশঃ সূর্য্য হয়ে দাঁড়ান প্রধানতঃ আরোগ্যের দেবতা, পুরাণকার ও নিবন্ধকারগণ বিশেষ করে তাঁর এই স্বরূপটির উপরই জোর দেন। বৈদিক যুগে যা ছিল সূর্য্যের বহু স্বরূপের অন্ততম, পরবর্তী কালে তাই হয়ে দাঁড়ান সূর্য্যের প্রধানতম স্বরূপ। ভারতীয় সৌরধর্মের প্রাচীন ও নবীন, দুই পর্বেরই সমানভাবে উপস্থিত এই লক্ষণীয় বিশেষত্বটির জুড়ই ভারতীয় জনমানস উক্ত দুটি দ্বারার মধ্যে কোনও পার্থক্য অনুভব করেনি, উপাসকমণ্ডলীর দৃষ্টিতে তারা সহজে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল। মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণও যে তাঁদের দ্বারা এদেশে আনীত সৌরধর্মের নূতন অধ্যায়কে বৈদিক সৌরধর্ম হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেননি, নিজেদের যে তাঁরা বৈদিক সৌরধর্মের উত্তরসারক প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট ছিলেন, তার প্রমাণ আবিষ্কার করা সম্ভবতঃ কঠিন নয়। তাঁদের মধ্যে বেদচর্চার প্রচলনের দৃষ্টান্ত সাহিত্যে ও শিলালেখ পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণে মগগণকে “বেদবাদী” বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং শাকদ্বীপে যে বৈদিক বিধি অনুযায়ী সূর্য্যের পূজা হয়, সে বিষয়েও সূর্য্যের মুখ দিয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করানো হয়েছে^{১০}—

“তেভ্যো বেদাশ্চ চত্বারঃ সরস্বতা মনোদিতাঃ

বেদোক্তৈঃ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পরৈশ্চ হৈর্ময়া কৃতৈঃ ॥

১০। ভবিষ্যপুরাণ ১, ১৩২, ৭৩-৭৭, ৯০ (বেঙ্কটেক্স প্রেস সং, পৃ: ১২৫-২৬)।

“তে চ ধ্যায়ন্তি মামেব যজন্তে মাং চ নিত্যশঃ ।

মদ্বামস্ৱা মদ্যজ্ঞানা মদুজ্ঞান মংপরায়ণাঃ ॥”

গোবিন্দপুর শিলালিপিতে উল্লিখিত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবংশে যে রীতিমত বৈদিক সাহিত্যের চর্চা ছিল, তার প্রমাণ ঐ শিলালিপিতেই আছে। বংশের আদিপুরুষ ভরদ্বাজকে সেখানে বলা হয়েছে “সমস্তনিগমজ্ঞানাস্ত্রবিজ্ঞাপদ।” ত্রয়োবিংশ শ্লোকে বংশের পরবর্তী কয়েক জন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে—

“সংকল্পপ্রবণাঃ ঐতিপ্রণয়িনঃ শিক্ষাভিরুদ্ভাসিতাঃ ।

সজ্জ্যোতির্গতয়োঃ নিরুক্তবিশদাশ্চন্দোবিধৌ সাধবঃ ।

ধ্যাতা ব্যাকরণধর্মণে বিহ্বামত্যাচ্চবীক্ষীলমা ।

বেদাঙ্গপ্রতিমাঃ যত্তেব ভুবনে তে বিজতি জাতরঃ ॥”

অতরাং দেখা যাচ্ছে, নিষেদের ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী প্রমাণ করবার জন্য বহিরাগত মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সম্রাটদের পক্ষ থেকে সম্ভবতঃ চেষ্টার ক্রটি হয়নি। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। বিশেষজ্ঞগণের মতে সেন-যুগে বাংলা দেশে যে স্বর্ঘ্যের পূজা প্রচলিত ছিল, সে স্বর্ঘ্য বৈদিক দেবতা নন, মগ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ভারতে আনীত ইরাণীয় স্বর্ঘ্যদেবতা; এবং খোদিত লিপিতে কোনও কোনও সেনবংশীয় রাজার “পরমসৌর” উপাধি, তৎকালীন যে সৌরধর্ম ও সৌরসম্রাটের অস্তিত্ব স্মৃতিত করে, সেই ধর্ম এবং সম্রাটদের বিদেশী ইরাণীয় প্রভাবগুণ্ট।^{৫১} কিন্তু প্রাচীন বাংলা দেশের উক্ত বিদেশী প্রভাবাবিহীন স্বর্ঘ্যপূজা যে বাহ্যতঃ বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে রক্ষা করেছিল, তা সম্ভবতঃ বোঝা যায় “পরমসৌর” বলে অভিহিত সেনরাজ কেশবসেন ও বিষ্ণুপসেনের তাম্রশাসনে প্রাপ্ত স্বর্ঘ্যের বন্দনাত্মক শ্লোকটি পাঠ করলে। কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন থেকে শ্লোকটি উদ্ধৃত করা হল—^{৫২}

“বন্দেহরবিন্দবদনবান্ধবমঙ্গলকারকারানিবদ্ধভুবনজয়ন্তিভেত্তম্ ।

পঞ্চ্যাবিস্তৃতসিতাসিতপক্ষমুখমুডান্তমভূতধ্বং নিগমক্ষমন্ত ॥”

এখানে স্বর্ঘ্যকে স্পষ্টভাবে “নিগমক্ষমন্ত অভূতধ্বং” অর্থাৎ ‘বেদরূপী তরুতে অবস্থিত অভূত পক্ষী’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতরাং মনে হয়, প্রাচীন বাংলার সৌরধর্ম মূলতঃ বিদেশীপ্রভাবগুণ্ট হয়ে থাকলেও বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাকে আপোষ করতে হয়েছিল।

এইরূপে বৈদিক ও ইরাণীয় সৌরধর্মের সময়ের কলে আরোগ্য-দেবতা হিসাবে স্বর্ঘ্যের আসন ভারতীয় ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। রঘুনন্দন প্রভৃতি স্বতীকারগণের সাক্ষ্য যদি বিশ্বাস করতে হয়, তা হলে এ কথাও মানতে হয় যে, অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতক পর্যন্ত স্বর্ঘ্যের রোগ-হর স্বরূপের অর্চনা ভারতীয় সৌরধর্মের একটি বিশিষ্ট ও

৫১। রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় সং), পৃ: ১৪৫-৪৬ ।

৫২। N. G. Majumdar : Inscriptions of Bengal, Vol III, pp. 121, 143

প্রধান অঙ্গ ছিল। বর্তমান কালে প্রচলিত হিন্দু আচার ও ধর্ম্মাছুষ্ঠানসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সে সকলের মধ্যে সূর্য্যপূজার স্থান উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের অর্চনার পূর্ব্বপ্রাধাঙ্গ্য বর্ত্তমানে আর নেই। হিন্দুর নেতৃত্বক্রিয়াকর্ম্মাছুষ্ঠানে সূর্য্যপূজার মূল বৈদিক ঐতিহ্যই যেন বর্ত্তমানে অধিকতর সক্রিয়। এবং সে ক্ষেত্রেও বৈদিক ঐতিহ্যের ধারা থেকে সূর্য্যের রোগহর স্বরূপের উপাসনা লুপ্তপ্রায়। আধুনিক কালে প্রচলিত নানা লৌকিক ব্রতামুষ্ঠানের মধ্যে (যেমন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শালিত 'সূর্য্যব্রত' 'ভপাব্রত' 'ইতুপূজা' 'মাঘমঙলব্রত' প্রভৃতি অমুষ্ঠানের কোনও কোনওটির তিতর) হয়ত পুরাণোক্ত প্রাচীন সৌরব্রতগুলির স্থিতি কিয়ৎপরিমাণে রক্ষিত হয়েছে; কিন্তু স সকল ক্ষেত্রেও পূর্ব্বের জ্ঞায় সূর্য্যকে প্রধানতঃ রোগহর দেবতারূপে কল্পনা ও অর্চনা করবার বিধি দৃষ্ট হয় না। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদেশী প্রভাব যুক্ত হওয়ার কালে, সূর্য্যের ঐ স্বরূপের পূজা ভারতে এককালে বহলপ্রচলিত হয়েছিল, তার প্রাধাঙ্গ্য ও গুরুত্ব, মধ্যযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই। সৌরধর্ম্মের এই পরিণতির ইতিহাস অবশ্য বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়।

7604

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৭শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা

১৩৫৭

বাংলা বিরামাদি চিহ্ন

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানিধি

পূর্বকালে বাংলা গল্প রচনায় মাত্র এক-দাঁড়ির ব্যবহার ছিল। পক্ষে, পন্নারে প্রথম অংশে এক-দাঁড়ি ও দ্বিতীয় চরণে দু-দাঁড়ি এবং ত্রিপদী-ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় পদের পরে আরি (৪) অঙ্কের তুল্য একটা চিহ্ন দেওয়া হইত। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী কমা ও আরও দুই-একটি চিহ্ন বাংলা রচনায় প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাঁর গ্রন্থের তাদৃশ প্রচার ছিল না; সর্ব-সাধারণে তাহাঁর অঙ্গুরণ করিতেম না। ৭০৮০ বৎসর পূর্বের লিখিত পত্র ও দলিল-দস্তাবেজে দাঁড়ি ভিন্ন কোন চিহ্নই থাকিত না। বিজ্ঞানাগর মহাশয় অনেক ইংরেজী বিরামাদি চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাঁর পাঠ্য-পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়াতে বাংলা রচনায় সে সব চিহ্ন প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু অত্যাধিক সে সকল চিহ্নের বাংলা নাম রচিত ও প্রচারিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, পাদচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ, প্রস্ন-চিহ্ন ইত্যাদি চিহ্নের নাম নহে, চিহ্ন-প্রয়োগের নাম। কমা-চিহ্ন দ্বারা পাদচ্ছেদ, কি অর্ধচ্ছেদ, কি আর কিছু বুঝিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত হয় না। গণিত পুস্তকেও বহুবিধ চিহ্ন প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু সে সকলেরও বাংলা নাম নাই। যুক্ত-চিহ্ন, বিযুক্ত-চিহ্ন ইত্যাদি বলিলে সে সে চিহ্নের আকার বুঝিতে পারা যায় না। প্রথমে চিহ্ন, পরে নাম, তার পর প্রয়োগ নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত। আমি ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের “প্রবাসী”তে “বালালা নবলিপি” নামক প্রবন্ধে আবশ্যিক যাবতীয় চিহ্নের নাম সঙ্কলন করিয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কিম্বা পশ্চিম-বঙ্গ-রাজ্যের অঙ্গমোদন ব্যতীত প্রচারিত হইতেছে না; এই অভাবও দূর হইতেছে না।

এক্ষণে ইংরেজী বিরামাদি চিহ্নের আমার উদ্ভাবিত নামের সার্থকতা দেখাইতেছি।

চিহ্ন

নাম

, কলা। ইহার আকার এককলা চক্ষের জ্ঞায়। কলা হইতে কড়া, চারি কড়ায় এক গণ্ডা। কলা, এই নামের দ্বারা পাদচ্ছেদও বুঝাইতেছে।

; বিন্দু-কলা। কলার মাধ্যম বিন্দু, বিন্দুটি এক কলার বিন্দু। অতএব, দুই কলার যোগ হইয়াছে।

’ উৎকলা। অর্থাৎ, যে কলা কোন অক্ষরের পরে নীচে না বসিয়া উপরে বসে। আমি ইহার নাম ‘উৎকলা’ রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এই সঙ্কর নাম ভাল হয় নাই।

‘ ’ ব্যুৎকলা। বি-উৎকলা, অর্থাৎ উৎকলা ও ব্যুৎক্রমে আর এক উৎকলা।

“ ” এই ব্যুৎকলা দুইটি দুইটি হইলে “জোড়া-ব্যুৎকলা”।

চিহ্ন

নাম

বিন্দু। কোন শব্দের অক্ষর অকারান্ত পড়িতে হইলে সে অক্ষরের পরে বিন্দু-চিহ্ন দিলে পাঠকের উচ্চারণে সুবিধা হয়। যেমন,—
কটমট করে' তাকাচ্ছে; কিন্তু কট.মট. চোখ। শিব দেবতা; কিন্তু শিব.
মঙ্গলময়।

। দাঁড়ি। অর্থাৎ, দণ্ডাকৃতি।

॥ দু-দাঁড়ি। দুইটি দণ্ড।

? খঞ্জা। খঞ্জার আকার-সাদৃশ্যে নাম।

! তিলক। ললাটে অঙ্কিত তিলকের তুল্য।

। বিতিলক। অর্থাৎ বিপর্যস্ত তিলক। সম্বোধন চিহ্ন। পূর্বে সম্বোধন চিহ্নের পর তিলক দেওয়া হইত। এক্ষণে প্রায় দেওয়া হয় না, কলা দেওয়া হয়। কারণ, বাক্যে সম্বোধনের পরে 'তুমি' অথবা 'আপনি,' 'তোমার' বা 'আপনার' এইরূপ শব্দ লিখিত হয়। তদ্বারাই সম্বোধন বুঝিতে পারা যায়। যথা,—মহারাজ, আপনার জয় হউক। তথাপি কোন কোন স্থলে সম্বোধন চিহ্ন থাকিলে অর্থবোধ সুগম হয়। যথা,—ভারতমাতা। আমরা স্বাধীন হইয়াও উপবাসী রহিয়াছি।

— রেখ। (ইং ড্যাশ)।

(-) লিক। (বাং লিকি, সং লিফা, ইং হাইফেন)।

Λ কাকপদ। সংস্কৃত নাম।

* তার। এইরূপ দ্বিতারা, ত্রিতারা।

+ ত্রিশূল।

P পতাকা।

বেটনীর চিহ্ন,—

() চাপ।

{ } দীর্ঘ চাপ।

[] বাহ।

গণিত কর্মের চিহ্ন,—

+ বহু। (সংস্কৃত নাম)।

- রেখক। (বিয়োগ চিহ্ন)।

× হীরা। (ইহা হইতে বাং চেরা, যেমন চেরাসই)।

÷ বিন্দু-রেখক।

/ তির্যক। ভাজন চিহ্ন।

= ঘিরেখক।

চিহ্ন

নাম

৷ ইলেখ। (অর্থাৎ ই-লেখ)। কড়া, গঙা ইত্যাদি বুঝাইবার চিহ্ন।
অঙ্কের বামে বসে।

৸ বিলেখ। (অর্থাৎ বিশিরক ইলেখ)। কাহন বুঝাইবার চিহ্ন। অঙ্কের
দক্ষিণে বসে।

উৎকলার 'ঞ' প্রয়োগ।

কোন কোন শব্দের মৌখিক উচ্চারণে 'ই' এবং 'ঞ-ফলা' প্রাপ্ত হয়। লিখনে এই লুপ্ত বর্ণ না জানাইলে প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায় না। যেমন কলিকাতা, মৌখিক উচ্চারণে 'কলকাতা' নয়, কইলকাতা (ঈষৎ-ই)। এই ঈষৎ-ই জ্ঞাপনের নিমিত্ত উৎকলা দেওয়া আবশ্যিক। এখানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদে যথাস্থানে উৎকলা প্রয়োগের প্রয়োজন দেখাইতেছি।

(১) বিশেষ্য পদে,—

চা'ল (চলন, যেমন নবাবী চা'ল। 'চাল' ঘরের)।

ভা'ল ('ভাল' গাছের)।

নোকার পা'ল ('পাল' গোরুর)।

নোকার হা'ল ('হাল' অবস্থা। 'হাল' বর্তমান, যেমন হাল সন)।

চাল-চলন, মার-ধর ইত্যাদি স্থলে পরবর্তী শব্দ হেতু অর্থবোধে কষ্ট হয় না; এখানে উৎকলা না দিলেও চলে।

(২) বিশেষণ পদে,—

(১০) শব্দের উত্তর 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হইলে সংক্ষেপে ঞ-ফলা উচ্চারিত হয়। যথা,—চাকর+ইয়া=চাকর্যে (বাবু)। 'চাকরে বাবু' নয়। এইরূপ, আফ্লাজে ছেলে, পাহাড়ো সাপ, বেগুন্তে রং, আশুন্তে বোমা। আরও সংক্ষেপ করিতে হইলে, শব্দের শেষে ঞ-ফলা স্থানে উৎকলা দিলে ঞ-ফলা লুপ্ত বৃত্তিতে পারা যায়। যথা,—চাকরে' বাবু, আফ্লাদে' ছেলে, ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য,—শীতকাতুরে, আমুদে, হাটুরে, সাপুড়ে ইত্যাদি শব্দে পূর্ববর্তী বর্ণে উকার-যোগ হেতু শব্দের অন্তে উৎকলা দিবার প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি অতিপ্রচলিত শব্দে 'ইয়া' প্রত্যয় হইলেও উৎকলা দিতে হয় না। যেমন,—পূবে (পুবিয়া) বাতাস, বিশে (বিশিয়া) পৌষ, ইত্যাদি।

(১০) 'উয়া' প্রত্যয়ান্ত শব্দে মৌখিক ভাষায় 'উয়া' স্থানে 'ও' হয়। যেমন,—জলুয়া=জলো (ছব)। কিন্তু এই বানানে 'জ' অক্ষরের উচ্চারণ অকারান্তই থাকে; আমরা যেমন উচ্চারণ করি, তেমন হয় না। 'জ'এর পর ঈষৎ-ই উচ্চারিত হয়। অতএব, 'জ'লো ছব' লেখাই উচিত। এইরূপ ম'দো গদ্ধ, প'ড়ো বাড়ী, পাঠশালার প'ড়ো, ইত্যাদি।

(৩) ক্রিয়াপদে,—

(১০) হইল, হইত, হইলে, হইতে ইত্যাদি স্থলে যথ্যর 'ই' প্রাপ্ত হইয়া মৌখিক

ভাষায় “হ’ল, হ’ত, হ’লে, হ’তে” হয়। এখানে উৎকলা ঈষৎ-ই লোপের চিহ্ন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

(৮০) “করিও, বলিও” ইত্যাদি মৌখিক ভাষায় “ক’রো, ব’লো” লেখাই উচিত — “ক’রো, ব’লো” লিখিলে অর্থ ঠিক হয় না। এইরূপ ইত, ইল, ইব ইত্যাদি ষাটু-বিত্তির “ই” প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে উৎকলা দেওয়া কর্তব্য। যেমন,—করিত—ক’রত, করিল—ক’রল, করিব—ক’রব।

(৮১) সে বসে গল্প করে চলে যায়,—এইরূপ লিখিলে অর্থ দাঁড়ায়, সে উপবেশন করে, গল্প করে, চলে, পরে, যায়। কিন্তু বক্তা বলিতে চাহেন, “সে বসিয়া গল্প করিয়া চলিয়া যায়।” অতএব শুদ্ধ বানান,—সে বসে’ গল্প করে’ চলে’ যায়। এই সকল স্থলে ষাটুর উত্তর ‘ইয়া’ প্রত্যয় যুক্ত; অক্ষরলোপের চিহ্নই উৎকলা।

(৮২) ক্রিয়াপদের অন্তে ‘ইয়ে’ থাকিলে উৎকলা আবশ্যক হয় না। কারণ, ‘য়’এর উচ্চারণই যথেষ্ট। যেমন,—বসে’ দাঁড়িয়ে কাল কাটায়। এইরূপ, খেয়ে, দিয়ে, হয়ে ইত্যাদি।

(৮৩) দৌড়ে যায়, শুনে হাসে, খেলে পালায়, মেয়ে ধরে, ইত্যাদিতে উৎকলা না দিলেও অর্থবোধে কষ্ট হয় না।

প্রথমে বিচার্য, উৎকলা বর্ণলোপের-চিহ্ন, না ঈষৎ-‘ও’ উচ্চারণের চিহ্ন? যদি ‘ও’ উচ্চারণের চিহ্ন হয়, তাহা হইলে ব্যুৎপত্তি পাই না। ব্যুৎপত্তি অনুসারে বর্ণলোপের চিহ্ন রাখাই কর্তব্য।

এক্ষণে যাইরা উৎকলা প্রয়োগে আলস্য বোধ করেন, তাইরা ভাবিয়া দেখেন না, তাইরা বাংলা ভাষা শিক্ষা কঠিন করিয়া ফেলিতেছেন। একবার আমি “চাল-তত্ত্ব” নামে একখানি পুস্তক পাইয়াছিলাম। নাম হইতে বুঝিয়াছিলাম, ‘গৃহের চাল নির্মাণতত্ত্ব’। পড়িয়া দেখি, চাউল বা চাইলতত্ত্ব। আর একখানি পুস্তকের নাম “চার-স্থান”। আমি বুঝিয়াছিলাম, চর-সন্নিবেশ। গ্রন্থকার বলিতে চাহেন, চারি স্থান, সংক্ষেপে চা’র-স্থান। সম্প্রতি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ধারিত একখানি পুস্তক দেখিলাম। পুস্তকখানি মৌখিক ভাষায়, না কোন্ ভাষায় লিখিত, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই পুস্তকের কুত্রাপি উৎকলা নাই। এইরূপ পুস্তক পড়িয়া বালক-বালিকারা লৈখিক বা মৌখিক, কোন ভাষাই শিখিতে পারিতেছে না। ইহার প্রতিকার কর্তব্য।

ভাষা চতুর্বিধ-রূপ

ত্রিহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

“চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানি তানি বিচূর্যাক্ষণা য়ে মনীষিণঃ ।

শুভা ত্রীণি নিহিতা নেংগয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥”—ঋগ্বেদ ১. ১৬৪. ৪৫ ।

“বাক্সমূহের পদসমুচ্চয় চারি প্রকারে পরিচিত । লোকে যে বাক্ (ভাষা) প্রচলিত আছে, তাহা চতুর্বিধ । বেদবিৎ মনীষিগণ এই চতুর্বিধ পদ জ্ঞানেন । তাহাদের মধ্যে ত্রিবিধ শুভ্য নিহিত বা স্থাপিত, প্রকাশিত হয় না । চতুর্থপ্রকার পদ অজ্ঞ বা পদজ্ঞ মনুষ্যেরা স্পষ্ট উচ্চারণ করেন বা ব্যবহার করেন ।”—(ভাষ্যানুবাদ)

এই চারি প্রকার পদ কি ?—এ বিষয় অনেকে স্ব স্ব মতামুসারে নানাপ্রকারে বর্ণনা করেন :—

(১) কোন কোন বেদবাদী বলেন,—সকল বৈদিক বাক্সমূহের সংগ্রহরূপ ভূঃ প্রভৃতি ব্যাক্তিভিন্ন ও এক প্রণব । ব্যাক্তিভিন্ন বেদত্রয়ের সারভূত এবং অকারাত্মক প্রণব সারসংগ্রহ—এই হেতু সপ্রণব ব্যাক্তিসমূহে বাক্সমূহ পরিচিত, অর্থাৎ চতুর্বিধ বিভক্ত ।

(২) ব্যাকরণ-মতামুসারীর সিদ্ধান্ত,—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত ভেদে বাক্সমূহ চতুর্বিধ ; অব্যপ্রধান নাম, ক্রিয়াপ্রধান আখ্যাত, আখ্যাতের পূর্বে প্রযুক্ত প্র-প্রভৃতি উপসর্গ, নানার্থে নিপাতনহেতু ‘অপি’ ‘তু’ ‘চ’ ইত্যাদি নিপাত ; এই চতুর্বিধে বাক্সমূহ পরিচিত । এই প্রকারে অখণ্ড বাক্সমূহ চারি ভাগে ব্যাখ্যাত ।

(৩) যাজ্ঞিকগণের মত,—মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ লৌকিক ভাষা । যাজ্ঞিকেরা বিশেষ ভাবে বলেন,—অমুঠেয়ার্ধ-প্রকাশক বেদভাগ মন্ত্র, অতঃপর কল্প, মন্ত্রার্থপ্রকাশক বেদভাগ ব্রাহ্মণ, ভোগবিষয়—‘গাভী’ ‘অখ’ ইত্যাদিপ্রকার ব্যবহারিক ভাষা,—এই চতুর্বিধে সকল ভাষা নিয়মিত ।

(৪) নিরুক্তবেদীরা স্বীকার করেন,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও ব্যবহারিক ভাষা :—এই চারিটিতে সর্বভাষা বিভক্ত ।

(৫) ঐতিহাসিকগণের অভিমত,—সর্গগণের, পক্ষিসমূহের ও ক্ষুদ্র সরীসৃপের ভাষা এবং ব্যবহারিক ভাষা—এই চারি ভাগে সকল ভাষা পরিচিত ।

(৬) আত্মবাদিগণ বলেন,—পশুসমূহের ও হরিণগণের (৭) ভাষা, বাক্সসমূহের স্বনি এবং আত্মভাষা—এই চতুর্বিধ ভাষা ।

(৭) তত্ত্ববিদভাষাবাদীরা প্রতিপাদন করেন,—মাতৃকাবর্ণমালার প্রকারান্তরে উচ্চারণে ভাষা চতুর্বিধ :—

(ক) পরা—মূলাধার হইতে উদ্গত একনাদাত্মক বাক্ বা ভাষা ‘পরা’ নামে অভিহিত ।

(খ) পশুস্তী—নাদস্বল্প, অতএব দুর্নিরূপ অর্থাৎ ইহার নিরূপণ ছকর, এই হেতু ‘পর্য’ হ্রস্বগামিনী হইলে পশুস্তী নামে কথিত হয়। ইহা যোগীরা দেখিতে পান, এই হেতু ইহা ‘পশুস্তী’।

(গ) মধ্যমা—‘পর্য’ বুদ্ধিগত ও বিবক্ষাশ্রোণ হইলে ‘মধ্যমা’ হয়। হ্রস্বনামক মধ্যে উদীয়মান হয় বলিয়া ইহা ‘মধ্যমা’।

(ঘ) বৈথরী—‘মধ্যমা’ মুখবিবর হইয়া কণ্ঠ তালু প্রভৃতির ব্যাপারে যখন বহির্গত হয়, তখন তাহা ‘বৈথরী’ নামে অভিহিত হয়।*

এইরূপে চতুর্বিধ বাক্যপদসমূহ পরিচিত। স্বাধীনমনাঃ রবান্য শব্দব্রহ্মের অভিজ্ঞ যোগিগণ এই ‘পর্য’ প্রভৃতি পদচতুষ্টয় জানেন। ইহাদের মধ্যে পর্য্য প্রভৃতি ত্রিবিধ পদ হ্রস্বান্তর্বর্তী, অতএব গুহানিহিত। ‘বৈথরী’ নামক চতুর্থ পদ সকল মনুষ্যই বলেন। ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধ নামাখ্যাতাদি পক্ষে প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিবিভাগবিং বাগ্‌যোগী পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ নামাখ্যাতাদি জানেন; বাগ্‌যোগে অনভিজ্ঞ পামরগণ চতুর্থ ভাগ বৈথরী ব্যবহার করেন, অর্থাৎ অর্থ প্রকাশার্থ প্রকাশ করেন।

সাহিত্যদর্পণে ‘পর্য’ প্রভৃতি চতুর্বিধ শব্দের বিবৃতি :—(অল্পবাদ) জ্ঞাত বিষয় বলিবার ইচ্ছায় তদবোধক শব্দ নিষ্পাদনার্থ প্রাণিপ্রেরিত অন্তঃকরণ মূলাধারস্থ অনলকে চালিত করে। সেই চালিত অনল তৎস্থানবর্তী বায়ুর চালনার্থ প্রসার প্রাপ্ত হয়; সেই চালিত বায়ুতে সেই স্থানে স্বল্পরূপে উৎপাদিত শব্দ ‘পর্য’ নামে অভিহিত। নাতিদেশ পর্য্যন্ত চালিত বায়ু তদ্রূপসংযোগ হেতু যে শব্দ উৎপাদন করে, তাহা ‘পশুস্তী’ নামে ব্যবহৃত। এই দুইটি স্বল্প-স্বল্পতর বলিয়া ঈশ্বরের ও যোগিগণের ক্রতিগোচর, আমাদের নহে। সেই বায়ু হ্রদয়দেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া হ্রদয়সংযোগে যে শব্দ উৎপাদন করে, তাহা ‘মধ্যমা’। কণ্ঠস্থান করিলে ইহা ধ্বজাত্মক বলিয়া স্বল্পরূপে কদাচিৎ আমাদেরও ক্রতিগোচর হয়। মুখ পর্য্যন্ত সমাগত সেই বায়ু কণ্ঠদেশে আসিয়া মূর্ধ্যয় আঘাত করে এবং মূর্ধ্যপ্রতিঘাতে পরাবৃত্ত হইয়া মুখবিবরে কণ্ঠাদি অষ্ট উচ্চারণস্থানে স্বীয় অভিঘাতে যে শব্দ উৎপাদন করে, তাহা ‘বৈথরী’ নামে কথিত।—সাহিত্যদর্পণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় শ্লোকস্থত টীকা।

পণ্ডিত মৃত্যঞ্জয় বিভাজনকার তদীয় ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’য় ‘পর্য’ প্রভৃতি চতুর্বিধরূপ ভাষা উদাহরণ-সংযোগে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন।—

“অনভিব্যক্তবর্ণা ধ্বনিমাত্ররূপা ‘পর্য’ নাম্নী ভাষা প্রথম, যেমন অভিনব কুমারদের ভাষা। তদনন্তর অভিব্যক্তবর্ণমাত্রা পশুস্তী নামক ভাষা দ্বিতীয়, যেমন প্রাপ্তবৎকিঞ্চিদ্বয়ঙ্গ বালকবাণী। তৎপর পদমাত্রাঙ্গক মধ্যমাত্রাভিগা তৃতীয়া ভাষা, যেমন পূর্বোক্ত বালকাবিক কিঞ্চিদ্বয়ঙ্গ শিশুভাষা। তার পর বাক্যরূপ বৈথরীনামধেয়া সকলশাস্ত্রধরূপা বিবিধজ্ঞানপ্রকাশিকা

* ‘বৈথরী শব্দনিষ্পত্তের্থমা ক্রতিগোচর। চোতিতার্থা চ পশুস্তী স্বল্পা বাগনগামিনী।’—কুমারসম্ভব ২.১৭, মনিনাথটীকা।

সর্বব্যবহার প্রদর্শিকা চতুর্থী ভাষা যেমন লৌকিক শাস্ত্রীয় ভাষা। ঈদৃশরূপে জ্ঞাতমাত্রাভাষ্যকের উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্তমানা চতুর্ভূতরূপা ভাষা অশ্বদাদিতে যুগপৎপ্রবর্তমানরূপে যত্বে প্রতীয়মানা হউন তথাপি পরা-পশ্চাত্তী-মধ্যমা-বৈখরীরূপ চতুর্ভূতরূপেতেই প্রবর্তমানা হউন।

ইহার প্রমাণ এই। দূরবর্তী হষ্টগামী লোকদের শ্রবণবিষয়ীভূত হষ্টাগত ধ্বনিমাত্রাভাষ্যক কেবল কোলাহল হয়। অনন্তর কতিপয় পথ গমনান্তর সমনন্ত শ্রবণেন্দ্রিয়সম্মিকর্ষবশতঃ ঋগুশঃ বর্ণমাত্রা গ্রহণ হয়। তদন্তর বসনভূষণ কদলী মূলক ইত্যাদি পদমাত্র শ্রবণ হয়। তদনন্তর হষ্টনিকটপ্রাপ্ত্যন্তর ক্রয়বিক্রয়কারী পুরুষদের বাক্যশ্রুতি হয়। অতএব অশ্বদাদি-ভাষা চতুর্ভূতরূপে প্রতীয়মানাভাষ্যহেতুক পূর্বোক্তক্রমে হষ্টস্থ পুরুষভাষার জ্ঞান ইত্যন্তমানে সকল মানুষভাষার চতুর্ভূতরূপনিশ্চয় হয়।—বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, ১৭০০ পৃষ্ঠা।

পুথির শেষ কথা

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আমরা প্রাচীন পুথির বিষয়বস্তু, লিপি, কাল ও উপকরণ লইয়া আলোচনা করি—মলাটের চিত্র ও কারুকার্যের বিচার করি। কিন্তু পুথির লেখক বা মালিকের কথা তেমন চিন্তা করি না। পুথির বিবরণ ঠাহারা সংকলন করেন, তাঁহারাও এদিকে তেমন দৃষ্টি দেন না—ফলে ইহাদের নিজস্ব কথা, যাঁহা সাধারণতঃ পুথির শেষের দিকে পাওয়া যায়, তাহা বিবরণের মধ্যে তেমন স্থান অধিকার করে না—অনেক ক্ষেত্রেই ইহা পুরাপুরি উদ্ধৃত হয় না। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনাও এ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমি বর্তমান প্রবন্ধে পুথির এই অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত প্রসঙ্গের প্রতি পুথিরসিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, ভবিষ্যতে ঠাহারা পুথির বিবরণ সংকলন করিবেন, তাঁহারা এই বিষয়টি সম্পর্কে যথোচিত অবহিত হইবেন।

পুথির শেষের দিকে লিপিকর বা পুথির মালিকের যে সমস্ত উক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইতে সামাজিক ইতিহাসের দিক্ দিয়া মূল্যবান অনেক তথ্য সংকলিত হইতে পারে। পুথি সাধারণতঃ নিজের ব্যবহারের জন্তই নকল করা হইত—তবে অনেক ক্ষেত্রে পুণ্যার্জন বা দানও ইহার উদ্দেশ্য ছিল দেখা যায়। পুথি নিরতিশয় শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইত। ধর্মশাস্ত্রে পুস্তকদানের অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। লিপিকরেরাও তাহার উল্লেখ করিতে ক্রটি করেন নাই। আমেদাবাদ হইতে প্রকাশিত প্রশস্তিসংগ্রহ নামক গ্রন্থে লিপিকরদিগের এইরূপ বহু উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, পৃ: ১২, ২৭, ৩১, ৩৮, ৪০, ৪৬, ৭১)। পুথি নকল করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার উল্লেখও এই সব উক্তির মধ্যে রহিয়াছে। উপযুক্ত পণ্ডিতকে বা দেবমন্দিরে পুথি দান করিয়া অনেকে গৌরব বোধ করিতেন (প্রশস্তিসংগ্রহ, ২১৭৫, ৩৮০, ৭৩৭, সোসাইটি [রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের পুথির বিবরণ] ৫১৩৭৩৫)। মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তনের পরেও বিস্তবান ব্যক্তির বিপুল ব্যয়ে গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই প্রসঙ্গে বর্তমানের রাজা কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারত ও তাহার অম্বুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অম্বুবাদ, রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পকম ও মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের ভাগবত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানেও শাস্ত্রাদি উপলক্ষ্যে গীতাди গ্রন্থদানের রীতি প্রচলিত আছে।

তবে নিতান্ত গৌরবজনক না হইলেও পুথিবিক্রয়ের প্রথাও যে ছিল না, এমন নয়। অনেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া পুথি লিখিয়া দিতেন—অনেকে পুথি বিক্রয় করিতেন। পুণ্যপুণ্যভাবে পুথি আলোচনা করিলে এ সম্পর্কে বিস্তর কৌতুককর বিবরণ সংকলন করা যাইতে পারে। আমি এখানে এই প্রসঙ্গে কিছু আভাস মাত্র দিতেছি। অতি প্রাচীন কাল

হইতেই যে অর্থের বিনিময়ে পুথির আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রশস্তিসংগ্রহ নামক পুর্বোল্লিখিত গ্রন্থে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নকল-করা এইরূপ হইখানি পুথির সাক্ষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে (১১৬১, ১৫৩)। ঊনবিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে পুথি নকলের পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত বেশি ছিল বলিয়া রেভারেন্ড ওয়ার্ড তাঁহার হিন্দুদিগের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, সেই সময়ে ৩২০০০ অক্ষর নকল করাইতে বার আনা বা এক টাকা দিতে হইত। তাঁহার মতে এই হারে মহাত্মারতের মত বিশাল গ্রন্থের পুথি নকল করাইতে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে এই হার বাড়িয়া চতুগুণ হইয়াছিল। এগিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তখন এই হার ছিল হাজার শ্লোক প্রতি চার টাকা।

পুথির মধ্যে এই সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, এইবার তাহার কিছু কিছু উল্লিখিত হইতেছে।

১১৫২ বঙ্গাব্দে নকল-করা কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গলের লিপিকর আশ্চর্য্যাম যোব লিখিয়াছেন :—

ইহার দক্ষিণ ১ ছোড় কাপড় আর ২ তঞ্চ। (সোসাইটি ৯১৩২২)

১১২৪ বঙ্গাব্দে নকল-করা মহাত্মারতের লিপিকবের উক্তি :—

ইহার দক্ষিণ সমান্তরতা ক্রমে অম্লসম্মে পরিপাল্য হইয়া সপ্রভা হইয়া পুস্তক লেখিয়া দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়া পাইবার আস্য হইল (শুকুমার সেন—বঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—৪৬৫ পৃঃ, পাদটীকা ৪)

লিপিকর দর্পনারায়ণ দাস যজুমদার ১১৩৫ সালে (রাজড়া সন ১১৩৫ সাল মন্সার সন ১২৩৬ সাল) চার কাণ্ড রামায়ণ লিখিয়া কিরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লঙ্কাকাণ্ডেব পুথির শেষে পাওয়া যায়। দর্পনারায়ণ লিখিতেছেন :—

সেইমত আনন্দেতে রাধ গুরুচরণ ধাসে।

কোন প্রকারে পুস্তক লইলে আমার পাশে।

দাসবাবু আমাকে দিলেন সাত টাকা।

সেই মত দাসের পাপ বস্ত্রাহ প্রভু একা।

পুস্তক লেখাইয়া আমার কৈলেন উপহার।

অনেক জঞ্জালে জ্ঞান করিলে বাবু কর্ণকার।

কর্ণকার বাবুরে রাম ভূমি কর দয়া।

পুস্তকসাক্ষতে বাবু দিবেন বস্ত্র মোয়া।

আমাকে গামছা দিবেন বহুবাদ ঘুঘি।

অতএব রাম দয়া কর সগোষ্ঠী পরিবারে আসি।

বালিচ্যা গ্রামবাসী আমি জাতি যে কামদ্বন্দ্বী।

চারি কাণ্ড রামায়ণ লিখিলাম সমস্ত ॥

—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্তরঞ্জন-সংগ্রহ, পুঁথিসংখ্যা ৩০৩।

পুঁথির মূল্য সম্বন্ধে ওয়ার্ডের লেখা হইতে জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক ষণ্ড অমরকোষ বা মুদ্রাবোধের পুঁথির দাম ছিল তিন টাকা। ১৮১২ সালে পূজাপতি গোস্বামীর গীতগোবিন্দটাকার এক ষণ্ড পুঁথি দশ আনায় বিক্রীত হইয়াছিল, এ কথা পুঁথিতেই লিপিবদ্ধ আছে (সোসাইটি, ৭ম ষণ্ড, পৃ: ১০৪)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই দ্বিতীয়চন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয় নিম্ননির্দিষ্ট পুঁথিগুলি পার্শ্বোক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন:—

কাব্যাদর্শ (২০০০ শ্লোক)...	১।০
কবিবল্লভ চক্রবর্তীর মাঘটাকা...	৫৮
নাগেশ ভট্টের রসযজ্ঞরীপ্রকাশ (২০০ অক্ষর)...	১।০
মল্লিনাথের কিরাতটাকা...	২৪০

১২১৮ বঙ্গাব্দে লিপীকৃত কুস্তিবাসের সম্পূর্ণ রামায়ণ পাঁচ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল—বিক্রয়ের সময় অবশ্য জানা নাই। পুঁথির প্রথম পত্রে এ বিষয়ে এইরূপ লেখা আছে:—

শ্রীউমাকান্ত চৌধুরী বিক্রদার ষড়ি শ্রীগকুলচন্দ্র সিল। মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র। সাং বরকামতা গ্রামাং। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫৭৪ সংখ্যক পুঁথি)

লেখক বা মালিক হিসাবে পুঁথির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। পুঁথি নকলের কারণ নিঃসন্দেহে পুণ্যার্জনের লালসা। পাণ্ডিত্যচ্যুরাংগই পুঁথি সংগ্রহের মুখ্য কারণ। তবে ধনী ব্যক্তির অল্প পাঁচটা জিনিষের মত পুঁথি সংগ্রহ রিয়াও তৃপ্তি পাইতেন। একজনের সংগৃহীত সকল পুঁথিই যে বর্তমানে একই স্থানে আছে, এমন নয়—অনেক স্থলে এগুলি নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন স্থানে হইতে বিভিন্ন পুঁথির সন্ধান করিয়া যেমন একজন গ্রন্থকারের পূর্ণ পরিচয় সংকলিত হয়, সেইরূপ ভাবে এক এক জন সংগ্রহকর্তার সংগ্রহেরও বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত হইতে পারে এবং অনেক অজ্ঞাত পুঁথিশালার সন্ধান মিলিতে পারে। বিশিষ্ট পণ্ডিত সর্ববিজ্ঞানিধান কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর পুঁথিশালার একটি তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুঁথিশালা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার পুঁথিগুলিরও হদিশ মিলিতে পারে। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় আমরা কবীন্দ্রাচার্যের নামমুদ্রাঙ্কিত কয়েকখানি পুঁথি দেখিয়াছি।^১ এইরূপ

১। পুঁথিগুলি বর্তমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞানাগর-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে দুইখানিতে নকল করািবার খরচেরও উল্লেখ আছে। মাঘটাকার পুঁথি ১২১৮ বঙ্গাব্দে পনের টাকায় নকল করান হইয়াছিল। আর ১৭০৬ শকাব্দে কিরাতটাকার লক্ষ্য বায় হইয়াছিল সাত টাকা। মুদ্রাবোধের বহুল প্রচারের ফলে পুঁথির চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় বিজ্ঞানাগর মহাশয় পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যেই পাইয়াছিলেন দেখা যাইতেছে।

২। বৃহতী (III. B. 125), ঋষেদসারণভাষ্য [৭৮২—১ (১)], বাশিষ্ঠলিঙ্গপুরাণ (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামসংগ্রহ ১৭০৪)। প্রকাশিত কবীন্দ্রাচার্যগ্রন্থচোঁতে বৃহতীর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া, কামদ্বন্দ্বের একখানি পুঁথি (৩১৩) বিজ্ঞানিধানের পুঁথির নকল বলিয়া মনে হয়।

নেপালের সুবরাজ বাহাদুর সাহের জন্ম ১৭১১ শকাব্দে লিখিত একখানি পুথি ও রণোচ্ছোত সাহের আদেশক্রমে ১৮৭৭ বিক্রমাব্দে লিখিত আর একখানি পুথি ঐ পুথিশালায় আছে (সোসাইটি ৮৬৬:৪, ৬৩০৮)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্ত সিংহের একখানি, গোপাল সিংহদেবের রানীর একখানি এবং মহারাণী আনন্দকুমারীর জন্ম লিখিত দুইখানি পুথি আছে (২৩৮, ২৬২, ১৩৬, ১৩৭)।

পুথির লিখন-পঠন রমণীসমাজেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহদেবের পত্নী ধ্বজাংশি পট্টমহাদেবীর বহুল্লিখিত প্রেমবিলাসের একখানি পুথি আছে (২৬২)। মহিলাদের পাঠের জন্য লিখিত পুথি সংকলিত ও প্রাদেশিক উভয় ভাষাতেই বিস্তর পাওয়া যায়। অন্নদেবীর পাঠের জন্য লিখিত শঙ্করাচার্যের সৌন্দর্যলহরীর একখানি পুথি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে (সোসাইটি ৮৬৬:২)। রমণীদের পাঠার্থে লিখিত বহু জৈনগ্রন্থের উল্লেখ প্রশস্তিসংগ্রহে পাওয়া যায় (২াপৃ: ১১৭, ৭০৯, ৭৩১, ৭৪২ প্রভৃতি)। মহারাণী আনন্দকুমারীর জন্ম লিখিত দুইখানি পুথির কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীপন্ন হয় যে, আধুনিকপূর্ব যুগেও মহিলাদের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন নিতান্ত কম ছিল না। সাধারণ লেখা-পড়া যে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল, তাহার সাক্ষী রামনারায়ণ ধূপীলিখিত রামায়ণের অবোধ্যা হইতে উত্তরাকাণ্ডের পুথি (পরিষৎ ১৫১), শ্রীমাহ মহম্মদলিখিত রামায়ণ সুল্লরাকাণ্ডের পুথি (পরিষৎ ৫২), শ্রীকান্তিক নাইর জন্ম বা তৎকর্তৃক লিখিত চৈতন্তমঙ্গল (পরিষৎ ২২৪), শ্রীচন্দ্রনারায়ণ পুণ্ডরির জগদ্বাণবিজয় (২৮৩), গোবর্দ্ধন জুগীর চৈতন্তমঙ্গল (২২০) ও শ্রীটোকার্নি যুগীর সময়গীতা (২১১) প্রভৃতি পুথি।

অনেক পুথির শেষে স্তম্ভর স্তম্ভর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে আছে লিপিকরদের একটি স্বীকার, পুথির দীর্ঘজীবন কামনা ও ইহার সংরক্ষণের আবেদন, পুথি অপহরণকারীর প্রতি অভিশাপ বর্ষণ এবং লেখক, পাঠক, মালিক, সকলের মঙ্গলকামনা। ইহাদের রচয়িতা বা রচনার কাল সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে কয়েক শত বৎসরের প্রাচীন পুথিতেও এগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন প্রান্তের পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলি প্রাচীনতর হওয়া সম্ভব। সুপরিচিত 'যথাবৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষকঃ' ইত্যাদি কবিতাটি একাদশ শতাব্দীর একখানি পুথিতে পাওয়া যায় (সোসাইটি ৮৬১১০)। 'লেখকো নাস্তি দোষকঃ' এই অংশটি পুরুষোত্তম দেবের (আনুমানিক দশম-বা দশ শতাব্দীর) ভাষাবৃষ্টি গ্রন্থে (২.২.২৪) উদ্ধৃত হইয়াছে। 'প্রশস্তিসংগ্রহে' উল্লিখিত ষোড়শ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর একাধিক গ্রন্থেও কতকগুলি কবিতা পাওয়া যায় (১৪, ১৪, ১৫, ১৭, ২৩, ২২, ১১১, ১৫৪ প্রভৃতি)। বাংলা পুথিতে ইহাদের অনেকগুলি বিকৃতরূপে বা অনূদিত আকারে স্থান পাইয়াছে। কিছু কিছু নতুন নতুন অভিশাপ বা দিব্যও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কবিতাসম্বন্ধীয়

আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া গভীর মারফতও 'দিব্য'-বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। সংস্কৃত-একখানি দ্বাদশ শতাব্দীর পুথিতে পুথিরক্ষার একটি আবেদন গড়ে নিবদ্ধ হইয়াছে (সোসাইটি ৩।১২২৪)।

বর্তমান প্রবন্ধে নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি বহুলব্যবহৃত উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। ইহাদের ব্যাপক সংগ্রহ ও সমালোচন বাঙালীয় বলিয়া মনে হয়।

লিপিকরের ঐটি স্বীকার :—

যদ্যদৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তিহোষকঃ ।

ভীমভাপি রণে-ভকো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ (সোসাইটি ৮।৬১১০)

যাদৃশং পুস্তকে দৃষ্টং তাদৃশং লিখিতং ময়া ।

যদি শুদ্ধমন্তব্যং বা মম দোষো ন দীয়তে ॥

(প্রশস্তিসংগ্রহ ১।১৭, ১৮, ২০, ২২, ৯২, ১১১) ।

অদৃষ্টদোষাৎ স্মৃতিবিলম্বাদ্ বা

যদ্বর্ণহীনং লিখিতং ময়াত্র ।

তং সর্বমার্গৈঃ পরিশোধনীয়ং

কোপো ন কার্যঃ খলু লেখকায় ॥

(প্রশস্তিসংগ্রহ ২।৫২৫, ১২৬১, তাক্সোর বিবরণ ১ পৃ. ২২,

৪ পৃ. ২৩৬৮)

অথা দিষ্টং তথা লিখিতং কহেন দ্বিজবর ।

দোষশূণ্য না লইবেন ঘাইট বা জীত অক্ষর ।

(পরিষৎ-পুথি, ২২৯)

লিখিলাম পোষা দোষ কেমিবে আয়ার ।

মদীনাঞ্চ মতিভ্রম আশি কোম হার । (পরিষৎ-পুথি—৭০)

ভিম হাদি ভুর্জ মানা রোনে হয় ভদ্র ।

মুনিগণের ভ্রম হয় আমি কি পতঙ্গ ॥ (পরিষৎ-পুথি—২৮৫)

শাস্ত্র অধিকারী দেবী সরস্বতী মাতা ।

তথাপি তাহার বিচলিত হয় কথা ॥

মহাবল হয় বেধ হস্তী মহাপর ।

তথাপি তাহার পর বিচলিত হয় ॥

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণ—৩। পৃঃ ৬৫৪-৫) ।

লিখনের মাঞ্জি দোষ এই ত বিচারি ।

কলাচিৎ তার যদি হয় ভুল জাতি ।

ভীমের সময়ে ভদ্র মুনিভ্রমে মতি ॥

শশীর সন্ধান তাহে অমর মিলন ।

এত দূরে এই পুথি হইল লিখন ॥

(ঐ—৫৫২ সংখ্যক পুথি)

অপহরণকারীর তিরস্কার :—

যত্নে লিখিতং চেতং যশোদায়তি পুস্তকম্ ।

শুকরী তন্তু মাতা চ পিতা তন্তু চ গর্ভজঃ ॥

(সোসাইটির পুথি সংখ্যা ৫২০৪)

পুস্তকং হরতে যন্ত কাণো দুঃখী ভবেদ্রয়ঃ ।

মৃতঃ স্বর্গং ন গচ্ছেত্তু পিতরং মরকং নয়ং ॥

(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির বিবরণ, ৫১৭৬)

অর্জিতং সুরিকষ্টেন পুস্তকং যচ্চ যেন্মনঃ ।

হত্মিচ্ছতি যঃ পাপী তন্তু বংশক্ষয়ো ভবেৎ ॥

(তান্তোর বিবরণ, ১৮১৪৫৮৫, সোসাইটি ৮৬০৬২)

আত্মনো হু পকারায়োপকারায় পরত্চ চ ।

ইদং হরতি যো মূঢ়স্তত্চ তাতঃ পশুর্জবম্ ॥

(সোসাইটি, ৭৪৯৭৫)

চৌর্বেণ নীষা বিষয়েব ভুজ্জ্বা ।

পিত্রা চ গুণং সহ নারকী ভাং ॥ (সোসাইটি ৭৫৫৮৯)

হুকে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদি মাতা পাপিৎ পিতা স্করং জর্ষে জর্ষে

(পরিষৎ-পুথি—১৭২)

এই পুস্তক যে বেঞ্জি চুরি করিবে । সে সাপুরে হইবেক যার পুত্রবধূকে হরণ করিবে

(পরিষৎ-পুথি—২৮৫)

এই ঐষ জে জামিয়ার বরপ চুরি করিআ রাধিবেক সেই মহাপাপের পাতকি । সে

বিয়াড' হইবেক (পরিষৎ-পুথি—৩৩১)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের ৬৬৭ সংখ্যক পুথির বিবরণেও অল্পরূপ উক্তি লক্ষণীয় ।

এ পুস্তক যে হরিবেক তাহাকে গোত্রাক্ষণ বধ জাগিবেক ।

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথির বিবরণ—৩৫৫২) ।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই জাতীয় 'দিব্য' বাঙ্গালীর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল । মনে পড়ে, আমরা বাঙ্গালীকালে আমাদের ছাপা বইয়েও এইরূপ কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতাম । এখনও আধুনিক ধরণের কিছু কিছু ছড়া শুনিতে পাওয়া যায় । ইংরাজিতেও বই সম্বন্ধে নানারূপ ছড়ার প্রচলন আছে বা ছিল । কয়েক বৎসর পূর্বে Wilson Bulletin for Books নামক পত্রের কয়েকটি ছড়া বা Book Rhyme সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । তুলনার জন্ত আমি এখানে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

Steal not this book, my honest friend
 For fear the gallows should be your end.
 And when you die the Lord will say
 And where's that book you stole away ?
 Look ye, my friend,
 If this book I lend,
 Be sure to return,
 Or in hell you will burn.
 Remember, Book, my cozy shelves
 From which my friends help themselves.
 And like a dove with wings unloosed
 Return, come back, fly home to roost.

পুথির সংরক্ষণ ও দীর্ঘজীবন কামনা :—

ভরপৃষ্ঠকট্টরীবাং ভদ্রদৃষ্টিরবোধুধম্ ।

কষ্টেন লিখিতং গ্রন্থং যত্নেন প্রতিপালয় ॥

(সোসাইটি, ৮১৬১১৪, প্রশস্তিসংগ্রহ, ১১১১, ২১৬৬৬) ।

উদকানলচৌরেভ্যো যুগ্মকৃত্যন্তধৈব চ ।

রক্ষণীয়া গ্রন্থেভ্যন যত্নাৎ কষ্টেন লিখ্যতে ॥

(প্রশস্তিসংগ্রহ, ১১১০৮, ১৪২)

তৈলান্দ্র রক্ষেক্সলাদ্ব রক্ষেন্দ রক্ষেন্দিধিলবক্ষনাৎ ।

যুৰ্ব্বন্তে ন দাতব্যমেবং বদতি পুস্তকম্ ॥

(প্রশস্তিসংগ্রহ, ২১১৫৪, ২০০, ৬৩৭, ৬৬৬, ৭৪০)

যাবল্লবণসমুদ্রো যাবল্লক্ষ্মমতিতো মেকঃ ।

যাবল্লক্ষ্মাদিত্যো তাবদিত্যং পুস্তকং ভদ্রম্ ॥

(সোসাইটি, ৮১৬১৪০, প্রশস্তিসংগ্রহ, ২১১০৮২)

মঙ্গলপ্রার্থনা :—

ত্রীমন্ত সর্বজগতাং ত্রীমন্ত লেখকে ময়ি ।

ত্রীমন্ত লিখিতং যন্ত তন্ত কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৪/১৬২-৩)

মঙ্গলং লেখকানাং চ পাঠকানাং চ মঙ্গলম্ ।

মঙ্গলং সর্বলোকানাং ভূমিভূপতিমঙ্গলম্ ॥

(প্রশস্তিসংগ্রহ, ২১১১৮, ১১৩৭, ১২২৮, ১২৫৫) ।

বাঙ্গালার মূর্তিবিদ্যা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী

১

এক সুপ্রসিদ্ধ মূর্তিবিজ্ঞাবিশারদ (Iconographer) বলিয়াছেন,—মূর্তিবিদ্যা শিথিলার একমাত্র জায়গা বাঙ্গালা দেশ(১)। কলিকাতার অবস্থিত ভারতীয় মিউজিয়ামের (Indian Museum) পুরাতত্ত্ব বিভাগে (Archaeological Section) সমগ্র ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে আজ পর্যন্ত যে সকল প্রস্তর, পোড়ামাটি (Terracotta), এবং ধাতুনির্মিত মূর্তি সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেগুলির গঠনভঙ্গী ও খোদাই অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, মধ্যযুগের (২) কিছু পূর্ব হইতেই বিশাল বঙ্গে, বিশেষ করিয়া পাল এবং সেন-রাজবংশের রাজত্বকালে বাঙ্গালী ভাস্কর্য্য ভারতবর্ষের মূর্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি নূতন স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন (ভট্টশালী মহাশয়ের মন্তব্য এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রাধিকারযোগ্য)।—সে এক অপূর্ব শৈলী (Style), বিশ্বের মূর্তিবিদ্যার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।(৩) বাঙ্গালা দেশে, এই মূর্তিবিদ্যার বিকাশের ধারাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করিলে কেবল মাত্র যে ভারতবর্ষের মূর্তিবিদ্যার ইতিহাসের নূতন দ্বার উন্মোচিত হইবে, তাহা নহে; আমাদের অলিখিত সভ্যতার ইতিহাসের (৪) এবং ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর ধর্মজীবনের ধর্মকথা ও

(১) ("The rule of the Palas was undoubtedly the most glorious period of Bengal's history. The earlier kings, such as Dharmmapala and Devapala, were very powerful princes of their time in Northern India. Flourishing schools of sculpture arose all over country and Taranath has preserved for us the names of two master-sculptors, Dhimana and his son Vitapala. But thousand other sculptors like these two, working in thousand different centres of culture, rapidly covered the country with a multitude of images, the mutilated remains of which still evoke everybody's admirations. Any one who has travelled in the villages of Bengal with open eyes, will be able to support the statement that there was hardly a single settled village in Pre-Muhammadan Bengal that had not its Buddhist and Brahmanical deities in stone and metal."—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, by Nalinikanta Bhattacharya, M. A., Curator, Dacca Museum. (p. 9).)

(২) সমগ্র আলোচনার মধ্যে মধ্যযুগ বলিতে এখানে ৮ম হইতে ১৩শ শতাব্দির ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ধরা হইয়াছে।

(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মিউজিয়াম, কলিকাতা, বারেন্স-রিসার্চ সোসাইটি, রাজসাহী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক চিত্রশালার সংগ্রহমালা হইতেও এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়।

(৪) অগণিত্য পুরাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক ডক্টর ডি, গর্ডন, চাইল্ড, ডি, এমসি, মহাশয় বলিয়াছেন—

"Archaeology furnishes a sort of history of human activity, provided always that the actions have produced concrete results and left recognizable material traces.....It has

আচার-পদ্ধতির বহু নির্ভরযোগ্য কাহিনী অবগত হওয়া যাইবে। (“A time has come when our history must be examined and written by us from our own point of view, from the point of view of our development and culture, our literature and art; our achievements.”)

২

মূর্তিবিদ্যার (ভাস্কর্যের) ইংরাজী নাম আইকনোগ্রাফি (Iconography), গ্রীক শব্দ ইকন (‘ikon’) হইতে আইকনোগ্রাফি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহা আরাধ্য দেব-দেবীর বা উল্লেখযোগ্য কোন মহাপুরুষের প্রতিকৃতিকে বুঝায়। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে মূর্তিবিদ্যার এই প্রকারের কোন বিশেষ একটি নাম নাই; এই বিশেষ বিজ্ঞা ভাস্কর্যের বৃহৎ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈদিক আরাধ্যগণ সূর্য, চন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতি উপাস্ত দেব-দেবীকে ধ্যান বা ধারণার মধ্য দিয়া স্বরণ বা উপাসনা করিতেন, অধ্যাপক Max Muller সাহেব বলিয়াছেন : “The religion of the Veda knows no idols.” ঋগ্বেদের বা অথর্ববেদের যে সকল শব্দ হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ‘আরাধ্যগণের মধ্যে লিঙ্গ উপাসনা পদ্ধতি (Fetishistic symbol) প্রচলিত ছিল’, তাঁহাদের উক্ত মন্তব্যগুলির মূলে বহু ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের একান্ত অভাব রহিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত (এবং পুরাণের) যুগে লিঙ্গ উপাসনার উৎপত্তির যে সামান্য বিবরণ রহিয়াছে, তাহা হইতেও মূর্তিবিদ্যার কোন বিশেষ একটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ‘বিগ্রহ’ এই শব্দ হইতে বেদের অধিকতর পরবর্তী কালের রচিত সাহিত্যে ভারতবর্ষে মূর্তিবিদ্যার সূচনা পরিলক্ষিত হয়। (গ্রীক শব্দ ‘ইকন’এর সহিত ‘বিগ্রহ’ শব্দের উদ্দেশ্যগত এবং অর্থগত সম্বন্ধ রহিয়াছে)। এই তো গেল আরাধ্যদের কথা। কিন্তু প্রাক-আরাধ্যযুগে বসিও যোগ সাধনা বা ধ্যানযোগ সিদ্ধম্বন্ধে divine attribute বা দেবত্বের পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত (৩৫), তবুও জীবিতদের মধ্যে লিঙ্গ-

enlarged the spatial horizon of history in much the same degree as the telescope enlarged astronomy's vision of space. It has extended history's view backward in time a hundred-fold, just as the microscope revealed to biology beneath the surface of gross bodies the lives of infinitesimal cells. Finally, it has altered the content of historical study in much the same sort of way as radio-activity affected chemistry. For one thing, archaeology is largely concerned with practical everyday things, contrivances and inventions like houses, drains, axes, and internal-combustion engines, that in themselves have affected the lives of far more people, and that far more profoundly, than any battle or conspiracy, but that formerly seemed beneath the dignity of scholarly history.”—Dr. V. Gordon Childe, *Progress and Archaeology* (London, 1944), p. 1.

(৩৫) “সিদ্ধম্বন্ধের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য” (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ সাল) জীননীমাধব চৌধুরী, (পৃ ১২৪-১৩১)।

পাসনা এবং বিশেষ ধরনের মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল (৯৬)। শুর জন মার্শাল, দয়ারাম হানী মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মহেন্দ্রোদাড়ে এবং হরপ্পার বহু পোড়ামাটির মূর্তি (terracotta figure) ও নানারূপ চিত্রলিপি হইতে উপরোক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন।

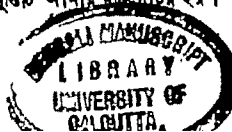
৩

বাঙ্গালা দেশে মূর্তি নির্মাণের প্রধান বিষয়বস্তু—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীকে আগম ও তন্ত্রের ধ্যানাঙ্কবাঈ প্রত্যক্ষভাবে রূপ দান করা। (বাঙ্গালা দেশে এত বিভিন্ন ধরনের দেব-দেবীর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যাইবার একমাত্র কারণ, মধ্যযুগে এখানে বহু তন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল)। মূর্তি নির্মাণের অল্প বাঙ্গালী ভাস্করগণ মূলতঃ প্রস্তর, বাতু, কাষ্ঠ এবং মাটি ব্যবহার করিতেন (“The materials recommended in the Agama for making images are wood, stone, precious gems, metals, earth and also a combination of two or more of the aforesaid materials.”) কিন্তু উত্তর-ভারতের মূর্তিবিভাগালয়গুলির (গান্ধার, যথুরা, মগধ, কোশালী) বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র, উহা মূলতঃ বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের ঘটনাবলীকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর এই বিষয়ে Grunwedel সাহেব বলেন : “The religious character, so deeply rooted in the national life of the Indian races, has also continued the guiding principle in the art.” (*Buddhist Art in India*, p. 1.)

আগম এবং শিল্পী,—অধ্যাপক রাও মহাশয় বলিয়াছেন : “The artist thus became handicapped and his imagination had no freedom of action. Not much scope could be given to the display of the genius of the artist, under any circumstances, although there is an Agama rule to the effect that the artist should fashion the images as best as he could.” (*Development of Hindu Iconography*). ভারতবাসীর জীবনের মধ্যে ধর্মের ব্যাপকতা এবং গভীরতাই তাহার চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের উপর প্রচ্ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাভীত দেব-দেবীর মূর্তি এই উক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত; কেবল মাত্র ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর নয়, সৌন্দর্য্যসাধক ভারতবাসীর সংস্কৃতির মর্ম্মমূলে প্রবেশ করিতে হইলে এই সকল মূর্তি নির্মাণের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবহমাণ ধারার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় করিতে হইবে।

(৯৬) উদাহরণস্বরূপ মহেন্দ্রোদাড়ে হইতে প্রাপ্ত একটি চিত্রিত গোলাকার (আনুমানিক ১২ ইঞ্চি ব্যাস) সূর্য্যমূর্তির কথা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। পাটনার সরকারী মিউজিয়ামের কিউরেটর মহাশয়ের আমন্ত্রণে যখন গত বৎসর (১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে) পাটনা মিউজিয়ামে রক্ষিত মহেন্দ্রোদাড়ে এবং হরপ্পা হইতে আবিষ্কৃত বিষয়বস্তুগুলি পরিদর্শন করিতেছিলাম, তখন উক্ত ক্ষুদ্র সূর্য্যমূর্তি আমার দৃষ্টিগোচর হয়।

৩



বাংলা দেশে আজ পর্যন্ত যতগুলি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগই মধ্যযুগের নির্মিত। ইহা হইতে অনেক ধারণা করেন যে, পাল এবং সেন-রাজবংশের পূর্বে বাংলাদেশে মূর্তি নির্মাণের বিশেষ প্রচলন ছিল না (* ৭) কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ভারত-সরকারের পুরাতত্ত্ব-বিভাগের মুখ্য পরিচালক এন. কে দ্বীকিত মহাশয় বর্তমান বাঁকুড়া জেলার পঞ্চরণা গ্রামে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তিগুলি দেখিয় মন্তব্য করিয়াছিলেন : 'পঞ্চরণা বাংলাদেশের মধ্যে পোড়ামাটির মূর্তিনির্মাণের প্রাচীনতম ক্ষেত্র।' আর ঐ মূর্তিগুলির অধিকাংশই ২য় হইতে ৬ষ্ঠ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত, অতএব পঞ্চরণা বাংলাদেশের মধ্যে ইতিহাসসম্মত প্রাচীনতম মূর্তিবিভাগক্ষেত্র। বাঁকুড়া জেলায় সিংভূম ও মানভূম জেলায় এমন শতাধিক মূর্তি আজও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পূর্বমধ্যযুগ বা তাহার আরও পূর্বের নির্মিত। শুকনিয়া গিরিলিপির মধ্যে গোলাকার শিখাবৃত্ত স্তম্ভের বিস্তৃক এই মূর্তিবিভাগের একটি জীবন্ত স্মৃতি, লিপির অক্ষরগুলি স্তম্ভের, সরল ও স্পষ্ট এবং উহা হইতে প্রাচীন বঙ্গের লিপিকুশলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় (* ৮)।

এক্ষেণে দেখা যাইতেছে, প্রাচীন কালে বাংলাদেশে বা বিশাল বাংলায় প্রধানতঃ দুইটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যবহুল মূর্তিবিভাগ (School of Iconography) ছিল।

(১) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার (বা রাঢ়ের) মূর্তিবিভাগ (Radha School of Iconography)।

বর্তমান সময়ে বর্তমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিভাগের পূর্বের সামান্য অংশ এবং ধলভূম, মানভূম, সিংভূম, উত্তর-পূর্ব উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-বিহার লইয়া ২য় ও ৩য় হইতে ১২শ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই মূর্তিবিভাগটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, (বাংলা দেশের মধ্যে এইটিই প্রাচীনতম মূর্তিবিভাগ)।

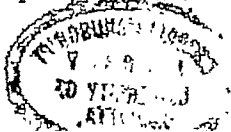
(২) উত্তরবঙ্গের গোড়া মূর্তিবিভাগ (Gouda School of Iconography)।

সমগ্র উত্তরবঙ্গ, পশ্চিম-দক্ষিণ কামরূপ ও বিহার লইয়া ৭ম হইতে ১৩শ শ্রীষ্টাব্দের (মধ্যযুগে) মধ্যে এই বিভাগটি বোদ্ধ এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(* ৭) "ভারতবর্ষের ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে বাংলার মূর্তিকলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকলেও দ্বিতীয় বর্ষ শতাব্দীর আগেকার মূর্তিশিল্পের কোনও নিদর্শন বাংলার মাটিতে আজ পর্যন্তও খুঁজ পাওয়া যায় না।"—'বাংলার ভাস্কর্য', (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃতাত্ত্বিক জিরালা হইতে প্রকাশিত) শ্রীকল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(* ৮) (ক) "According to the some scholar, is identical with the hero of the Susunia (in the Bankura district) inscription, which has been assigned to the 4th century A. D. (Hlp. Ind., Vol. XIII, p. 188 ff.)—Some Historical Aspects of the Inscription of Bengal. By Dr. Benoychandra Sen, M. A., Ph. D., (p. 187).

(খ) Eur-Asia, (International Monthly Journal), June, 1950, (p. 450 to 456), The Susunia Rook Inscription, By Rabindranath Choudhuri.



৫

উপযুক্ত নামের অভাবে প্রথম মূর্তিবিজ্ঞানটিকে আমি রাঢ়-মূর্তিবিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছি।

রাঢ় (বা রাঢ়গঙ্গা) বলিতে ভাগীরথীর পশ্চিম পার্শ্বের ভূভাগকে বুঝায়। আলেকজান্ডারের সময়ে গ্রীক ঐতিহাসিক Ptolemyর বিবরণ হইতে আমরা প্রাচীন রাঢ়ের একটি ভৌগোলিক বিবরণের আভাস পাই: "As to the situation of the Gangarides, the only information afforded by Ptolemy is that they held all the country about the mouths of the Ganges, which might include the whole delta, and that their territory contained the royal city of Ganga in long. 146°; lat. 19°15'. Neither Gangarides nor Ganga can be identified with any name occurring in India literature ('Outline of Geography') (Geographike Hyphegesis) of Clandius Plotemaeus (Ptolemy)." (* ৯)। বিষ্ণুপুরাণ হইতেও আমরা এই প্রাচীন ভূমির উৎপত্তির কিছু কিছু ইতিহাস জানিতে পারি।

ধর্মের ভিত্তিতে এই বিজ্ঞানের মূর্তিগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

(১) জৈন ধর্মসম্প্রদায়ের দেব-দেবী।

প্রাচীন রাঢ় মূলতঃ জৈনধর্মপ্রধান দেশ। প্রবাদ আছে, জৈন ধর্মপ্রবর্তক মহাবীর ধর্মপ্রচারের অল্প যখন বস্তুভূমে (বা দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে) আসিয়াছিলেন, তখন সেখানকার ভূমিজরা তাঁহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল (* ১০), কিন্তু পরবর্তী কালে তাহারা উত্তরগামী জৈন ধর্মের প্রবল প্রোতকোকে রোধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, ইহার প্রমাণস্বরূপ উক্ত অঞ্চলের শত সহস্র জৈন ধর্মের দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ৭ম খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েনের ভারতভ্রমণের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালাদেশে জৈন ধর্মমতবাদের বিশেষ প্রচলন ছিল।

(* ৯) 'The Early History of Bengal': By F. G. Monahan, I. O. S. (p. 204.)

(* ১০) "Colonel Dalton identifies the Bhumij with the 'Vajra-Bhumi' of the Jain legendary history, who hunted with dogs and arrows with deified saint Mahavir, when engaged in performing an ascetic pilgrimage through their country. This conjecture is strongly supported by the prevalence of Jain remains in many parts of Manbhum District, and by the tradition of both Bhumij and Hos that a people called Sarawakas who can hardly be other than Jains, were the earliest civilised inhabitants in Manbhum and the eastern portion of Singbhum. (Journal of the Asiatic Society for 1866, p. 188.) —A Statistical Account of Bengal, (Vol. XVII.) : By W. W. Hunter, B. A., LL. D., (p. 278.)

(ক) জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়ের (মধ্যযুগের পূর্বে নির্মিত) অলঙ্কারহীন, স্থূল, উল্লঙ্ঘ্য এবং আদিম যৌলিক প্রাথমিক দণ্ডায়মান পার্শ্বনাথ, মহাবীর এবং জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি।

(খ) মাধ্যম মুকুট, বৈদিক প্রাথমিক বজ্র উত্তরীয়, মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবীর ক্ষয় আপাদমস্তক, স্থূল অলঙ্কারমণ্ডিত জৈন খেতাধর সম্প্রদায়ের জৈন দেব-দেবীর মূর্তি, (এই মূর্তিগুলি প্রায়ই মধ্যযুগের মধ্যে নির্মিত)।

(গ) জৈন স্তূপও এই বিজ্ঞালয়ের মধ্যে দেখা যায়।

(২) বৌদ্ধ ধর্মের দেব-দেবী।

মধ্যযুগের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে জৈনধর্ম, হীনযান এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংমিশ্রণের ফলে এক অভিনব মিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। (উহা স্থূল বৌদ্ধ ধর্ম হইতে স্বতন্ত্র)।

রাতের পূর্বাংশে ও গৌড়ে (পাহাড়পুরে) বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, (প্রাচীন তাম্রলিপি বন্দর রাতের মধ্যে ছিল)। এখনও পশ্চিমবঙ্গে অনেক প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের আভাস পাওয়া যায় (* ১১)।

পূর্ব এবং প্রথমমধ্য যুগের মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধ, তারা, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি মূর্তি এবং প্রস্তর ও ইটের বৌদ্ধ স্তূপ (* ১২) এই বিজ্ঞালয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। (মগধের অন্তর্গত অবর মূর্তিবিজ্ঞালয়গুলির মধ্যে যে একটি গতিশীলতা ও প্রাণাবেগের ছাপ রহিয়াছে, তাহার বিশেষ প্রভাব এই মূর্তিগুলির মধ্যে দেখা যায় না)।

(৩) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেব-দেবী :

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রায় সকল দেব-দেবীর মূর্তিই এই বিজ্ঞালয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। (মূর্তিগুলি প্রায় সব মধ্যযুগের)। গৌড়মূর্তিবিজ্ঞালয়ের জীবন্ত ছাপ রাতের স্বর্ষ্য, জুগা এবং বিষ্ণুমূর্তির মধ্যে দেখা যায়, তবে ইহার সংখ্যা অল্প এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া সঠিক ভাবে বলা যায় না যে, মধ্যযুগের মধ্যে বঙ্গের এই ছুইটি প্রধান বিজ্ঞালয়ের মধ্যে প্রত্যেক কোন সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল)।

এই অধ্যায়ের মধ্যে পুঙ্করণা (বা পঞ্চরণা) অবর মূর্তিবিজ্ঞালয়ের বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং গিরিলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পুঙ্করণা (বা বর্তমান বরজোড়া) থানার অন্তর্গত দামোদরের তীরে অবস্থিত পঞ্চরণা গ্রাম বিষ্ণুভক্ত (বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী) মহারাজা সিংহবর্মার পুত্র মহারাজা চন্দ্রবর্মার রাজধানী ছিল। এই লিপি ৪র্থ খৃষ্টাব্দের,

(*১১) 'Modern Review,' (January, 1950),—'Buddhist Temple of Belera,' (p. 49).—Rabindranath Chaudhuri.

(*১২) 'Ancient Indian Education (Buddhist and Brahmanical)': By Dr. Radhakumud Mukerjee, M. A., Ph. D., (p. 498).

তারতবর্ষে তখন শুভযুগ (১১০) বর্ষমান পঞ্চরণাতে এই বিজ্ঞালয়ের আর বিশেষ কোন চিহ্ন নাই, অধিকাংশ দামোদরগর্ভে চলিয়া গিয়াছে, খননের সময় যে দুই দশটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অল্প বর্ষমানের আর এই বিজ্ঞালয়ের কোন ধারাবাহিক গবেষণা সম্ভব নয়, কলিকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয়ের আন্ততঃ চিত্রশালাতে পঞ্চরণার কয়েকটি দ্রষ্টব্য বিষয় রহিয়াছে। (* ১৪) (ছুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত রাতের কোন নিজস্ব মিউজিয়াম হয় নাই)।

পঞ্চরণার অধিকাংশ মূর্তিই পোড়ামাটির। এই অল্প দীক্ষিত মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, এখানকার ভাস্করগণ মূর্তি গঠনের অল্প মূলত মাটি ব্যবহার করিতেন। কিন্তু শুভনিয়া গিরিলিপি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঐ ভাস্করগণ প্রস্তরের খোদাই-কার্যে সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। লিপির মধ্যে পঞ্চরণা মূর্তিবিজ্ঞালয়ের traditional সংস্কৃতির ছাপ রহিয়াছে। আমি যে তিনটি বিষ্ণুমূর্তি পঞ্চরণা হইতে পাইয়াছি, তাহার বিবরণ এখানে দিতেছি।

(১) একটি পোড়ামাটির (terracotta) বিষ্ণুমূর্তি, (ঠিক এই রকমের একটি বিষ্ণু-মূর্তি কলিকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয়ের আন্ততঃ চিত্রশালাতে আছে; (* ১৫) মূর্তিটি ২৪-পরগণা জেলায় পাওয়া গিয়াছে)। ১৯৪৭ সালে দামোদরের গর্ভে প্রায় ১২ ফুট নীচে বালির মধ্যে এই মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে (৬ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি)। (২) একটি শক্ত বেলে পাথরের (sandstone), এইটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের। মূর্তিটির মধ্যে গতিশীলতা না থাকিলেও প্রাণাবেগ রহিয়াছে (৭ ইঞ্চি × ৪ ইঞ্চি)। মূর্তিটি ১০ ফুট নীচে একটি পুষ্করিনীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

(৩) একটি মূর্তি নরম (অপেক্ষাকৃত ভাল) বেলে পাথরের (sandstone), (৬ ১/২ × ৪ ইঞ্চি)। মূর্তিটি স্তম্বররূপে খোদাই-করা, অলঙ্কার দ্বারা শোভিত, প্রাণাবেগে পুষ্ট ও অপর ছুটি মূর্তি অপেক্ষা এটি অধিকতর পরবর্তী কালের খোদিত।

ঐ তিনটি মূর্তি ছাড়া আমি পঞ্চরণা হইতে কতকগুলি প্রাচীন মাটির ভাঙা, মাশ, পাশা, মাটির জালা (* ১৬) দামোদরের মধ্যে পাইয়াছি, ঐগুলি প্রায় সবই প্রথম-মধ্যযুগের। (দামোদরের বস্তার পর দক্ষিণ তীরে নদীর মধ্যে ৮।১০ ফুট নীচে সারিবদ্ধ কূপ এবং অস্তুত ধরণের সব মাটির পাত্র এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐগুলি সংগ্রহ করিবার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয় নাই)।

(* ১৩) 'Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India' (Vol. XIII),—1916-16, No 9 (p. 188), The Susunia Rock Inscription, By M.M. Haraprasad Sastri.

(* ১৪) 'History of Bengal' (Dacca University): By Dr. R. C. Majumder, M.A. Ph. D. (P, 520).

(* ১৫) 'বালোর, ভাস্কর্য' (কলিকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয়) চিত্র নং ২ বিষ্ণু—শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

(* ১৬) এই ধরণের বিরাট ও ভারী মাটির জালা মধ্য মূর্তিবিজ্ঞালয়ের অন্তর্গত নালন্দা মহাবিহারে খননের সময় পাওয়া গিয়াছে।

৬

রাঢ়-মূর্তিবিভাগের বৈশিষ্ট্য :

(ক) রাঢ়-মূর্তিবিভাগের ভাস্করগণ মূর্তি নির্মাণের অল্প মূলতঃ নিম্নলিখিত বস্তুগুলি ব্যবহার করিতেন :

- (১) প্লেট-পাথর, শতকরা ৩৫ ভাগ,
- (২) কৃষ্ণ শক্ত পাথর, শতকরা ৩০ ভাগ,
- (৩) বেলে পাথর, শতকরা ২০ ভাগ,
- (৪) মাটি (terracotta), শতকরা ১০ ভাগ, (এবং শতকরা ৫ ভাগ দারু এবং ধাতুনির্মিত মূর্তি এই বিভাগের মধ্যে পাওয়া যায়) ।

(খ) খোদাইয়ের প্রথা অনুযায়ী মূর্তিগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় :

(১) চিত্র (chitra) মূর্তি : এক খণ্ড প্রস্তর হইতে পূর্ণ মনুষ্যদেহের ভায় মূর্তির সমগ্র দেহ খোদাই করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পশ্চাদ্ভাগের কোন আবরণ নাই বা মূর্তি-দেহের কোন অংশ অবলুপ্ত নাই । (এই প্রকারের মূর্তির সংখ্যা শতকরা প্রায় ২০ ভাগ) ।

(২) চিত্রদ (chitrada) মূর্তি : মূর্তি-দেহের সমুখ হইতে মাত্র অর্দ্ধাংশ (বা ক্ষেত্রবিশেষে ঠে হইতে ঠে অংশ) খোদাই করিয়া বাহির করা হইয়াছে এবং বাকী অংশ পশ্চাতের মূল প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে অবলুপ্ত রহিয়াছে (প্রায় ৮০ ভাগ এই ধরনের মূর্তি এখানে দেখা যায়, এইগুলি স্থল এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বা প্রথম মধ্যযুগের) ।

মন্দিরগাত্রে শোভাবৃদ্ধি করিবার অল্প এক প্রকারের প্রস্তর বা ইটের চিত্রদ মূর্তির ব্যবহার এই বিভাগের মধ্যে বহুল পরিমাণে ছিল । সব প্রাচীন মন্দিরগুলির গাত্রেই পুরাণের বিভিন্ন ঈর্ষকাহিনী ধারাবাহিক ভাবে খোদাই করা দেখিতে পাওয়া যায়, (মল্লরাজাদের, শেষ মধ্যযুগের নির্মিত বিষ্ণুপূজার মন্দিরগুলির গাত্রে ইহার চরম বিকাশ আত্মগোচর আমাদের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে(১৭)) ।

(গ) চরিত্রের দিক্ দিয়া এই বিভাগের মূর্তিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

- (১) চল (movable) মূর্তি,
- (২) অচল (immovable) মূর্তি ও
- (৩) চল-অচল (movable-immovable) মূর্তি ।

(১৭) 'History of Bishnupore Raj' (An Ancient Kingdom of West Bengal)—By Mr. A. P. Mallik, B. A. B. T.

(১) চল-মূর্তি : এই শ্রেণীর মূর্তি সাধারণতঃ ব্যক্তিগত ভাবে আরাধনার অস্ত্র বা কোন উৎসব অমুষ্ঠানে ব্যবহারের অস্ত্র নির্মিত হইত। ঐগুলি লঘু এবং আকারে ক্ষুদ্র।

(২) অচল-মূর্তি : এই মূর্তিগুলি মন্দিরের মূল বিগ্রহরূপে নির্দিষ্ট থাকিত এবং কোন অবস্থায় এইগুলিকে স্থানচ্যুত করা হইত না বা মন্দিরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত না। মূর্তিগুলি আয়তনে বৃহৎ এবং গুরুভারাক্রান্ত হইত।

(৩) চল-অচল মূর্তি : এইগুলি সাধারণতঃ ১ম ও ২য়, এই উভয় কার্যের অস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

আদিশূরের প্রাচীন উল্লেখ

অধ্যাপক শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, এম. এ.

রাষ্ট্রীয় এবং বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা রাজা আদিশূর কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। কুলগ্রন্থে রাজা আদিশূর এবং তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিশ্বাসযোগ্য অপর কোন গ্রন্থাংশের পোষকতার অভাবে উক্ত কাহিনীর সত্যতা—এমন কি, আদিশূরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহান। সম্প্রতি একখানি প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থে আমি আদিশূর নামক এক বীরের উল্লেখ পাইয়াছি। ইনিই বিবাদাম্পদ রাজা আদিশূর কি না, তাহা নিম্নপদের অল্প আমরা সংশ্লিষ্ট অংশটির প্রতি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আচার্য মণ্ডনমিশ্রকৃত ‘বিধিবিবেক’ নীমাংসা শাস্ত্রে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এসিদ্ধ মৈথিল দার্শনিক সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচম্পতি মিশ্র উহার টীকা লিখিয়াছেন। টীকার নাম ‘জ্ঞানকপিকা’। উহাতে বাক্যের অর্থবিচার প্রসঙ্গে তিনি এই বাক্যটি উপস্থাপিত করিয়াছেন—নিজভুজবীর্যমাস্থায় শূরানাদিশূরো জয়তি [জ্ঞানকপিকা, কান্দী সংস্করণ, পৃ. ২০০]—নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া আদিশূর শূর(বীর)দিগকে পরাজিত করেন।

বাচম্পতি মিশ্র খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক। উক্ত বাক্যের ‘জয়তি’ পদে বর্তমান-কালস্থচক বিভক্তি দ্বারা বাচম্পতি ও আদিশূর সমসাময়িক, এইরূপ ইহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত আদিশূরও বোধ হয়, এই সময়ই বর্তমান ছিলেন। সুতরাং বাচম্পতি যে আদিশূরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই এই আদিশূর, এরূপ অনুমান করা বাইতে পারে। বস্তুতঃ বাচম্পতি এ স্থলে একজন সাধারণ বীরমাত্রেয় উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

বাচম্পতি বঙ্গদেশের সম্বন্ধিত মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। উল্লিখিত বাক্যে তিনি বঙ্গদেশের রাজা আদিশূরের নাম ও মহিমার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই সম্ভবপর। তাঁহার স্বদেশে অথবা নিকটবর্তী অল্প কোন স্থানে আদিশূর নামে কোন বিখ্যাত রাজার সম্মান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না।

ঐতিহাসিকেরা শূরবংশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আদিশূর সম্পর্কে এই উল্লেখের প্রামাণ্যও তাঁহাদের বিচার্য।

আলোচনা

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ঠাকুরের ক্ষুদ্র অথচ অতীব মূল্যবান আবিষ্কার অতঃপর বাদলার ঐতিহাসিকগণ সকলেই সাদরে আলোচনা করিবেন, আশা করা যায়। আমরা এ বিষয়ে আমাদের মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১। বাচস্পতি মিশ্র খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে লোক, পূর্ববর্তী নহেন। জ্ঞানসূত্রির রচনাকাল ৮৯৮ বৎসর (“বঙ্গবঙ্গবৎসরে”) বিক্রমাব্দ নহে, পরন্তু বিখিলার ও পূর্বাঞ্চলে চিরপ্রচলিত শকাব্দ বটে। বাচস্পতি ‘তাৎপর্যটীকা’য় (কাশীর সং, পৃ. ৩৩৯) “যথাহ ভদ্রস্বর্গোত্তরঃ” বলিয়া বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য স্বর্গোত্তরের “অপোহপ্রকরণ” গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। স্বর্গোত্তর খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বাধার লোক এবং ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান বাচস্পতির পক্ষে তাঁহার সঙ্গত নামোল্লেখ সম্ভবপর নহে। বাচস্পতি ভাস্কর্য্য ও ব্যোমশিবাচার্য্যের পরবর্তী এবং কন্দলীকারের সমকালীন; কন্দলীকার বাচস্পতির যুগান্তকারী গ্রন্থসমূহের সহিত স্বল্প পরিচয়ও কুত্রাপি সূচিত করেন নাই। এতদ্বিষয়ে আমাদের ইংরাজী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (Ganganatha Jha Research Institute Journal, vol. II., pp. 349-53)। স্মরণ্যং বাচস্পতির উল্লিখিত “আদিশূর”র অভ্যুদয়কাল হয় ৯৫০-১০০০ খ্রীঃ মধ্যে।

২। গোড়াধিপতি আদিশূর কান্তকূজ হইতে যে পঞ্চ বিপ্র আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ১২-১৪ পুরুষ অবন্তন বংশধরগণ বঙ্গালসেনের সভাসদ ছিলেন। স্মরণ্যং এই আদিশূর কিছুতেই খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পরবর্তী হইতে পারেন না। ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশস্তির প্রমাণবলে তাঁহাকে পালবংশের পূর্বে স্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত (সা-প-প, ৫২ খণ্ড, পৃ. ১০৭)। স্মরণ্যং বাচস্পতির সমকালীন আদিশূর গোড়াধিপতি আদিশূর নহেন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

৩। মিথিলানিবাসী বাচস্পতি তাঁহার উদাহরণ-বাক্যে ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিপতির উল্লেখ না করিয়া স্বদেশীয় পৃষ্ঠপোষক নরপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত। স্মরণ্যং গোড়ের আদিশূরের ২০০।৩০০ বৎসর পরবর্তী মিথিলাধিপতি পৃথক আদিশূরের অস্তিত্ব এখন প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে। এই “মৈথিল” আদিশূরের একজন বংশধর “বিখন্তর শূর” পূর্ববঙ্গে নোরাখালী জিলার ভুজুরা পরগণার আদি জমীদার ছিলেন। বিখন্তরের অবন্তন অষ্টম পুরুষ স্তুবিখ্যাত “লক্ষণ-মাণিক্য” সংলগ্ন ভাষায় বহু কাব্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই শূরবংশ ২০০ বৎসর পূর্বেও ক্ষত্রিয়চারী উপবীতধারী ছিল। আমরা প্রবন্ধান্তরে ভুজুরা রাজবংশের বিবরণ লিখিয়াছি (I. H. Q, XIV, pp. 737-46; প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৩, পৃ. ৩২৩-২২)। ভুজুরা-সমাজের ইতিহাস বিন্দুমাত্র আলোচনা করিলে সন্দেহ

থাকে না যে, বিশ্বস্তর মূলতঃ মৈথিল ছিলেন। তিনি “আদিশূরের বংশধর” (কৈলাসচন্দ্র সিংহ-রচিত, রাজমালা, পৃ. ৩২১); অথবা “আদিশূরের নবম পুত্র” (প্যারী-মোহন সেনকৃত নোয়াখালীর ইতিহাস, পৃ. ১৪) ছিলেন বলিয়া প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে। সম্ভবতঃ “নবম পুরুষ” অর্থেই নবম পুত্র কথাটি প্রচারিত হইয়াছিল। মহম্মদ তুঘলকের সময় (১৩২৫-৩৫ খ্রীঃ) বিশ্বস্তর দেশত্যাগী হইয়া থাকিলে তাঁহার উক্তন নবম পুরুষ আদিশূরের সময় প্রায় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হওয়া অসম্ভব নহে। কর্ণাটবংশের পূর্বে মিথিলায় শূরবংশের রাজত্ব ছিল, নূতন আবিষ্কার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে। মিথিলায় এই শূরবংশ এখনও বাঁচিয়া আছে কি না, অল্পসন্ধানযোগ্য এবং সঙ্গ সঙ্গ তুঘলকের শূরবংশের ইতিহাস এই নূতন আলোকে পুনরাবলোকিত হওয়া আবশ্যক। তুঘলক ব্রাহ্মণসমাজের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়, যাহা বাললা দেশের অল্পতর কুলাপি কখনও বিদ্যমান ছিল না। আমরা দুইটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতেছি। তুঘলক রাষ্ট্রীয়, বারেন্দ্র, সপ্তশতী, বৈদিক প্রভৃতি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান নাই। তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—“মৈথিল” ও “গৌড়”। উভয় শ্রেণীতে আচারাদিগত পার্থক্য থাকিলেও বিবাহাদি সম্বন্ধে আবহমান চলিতেছে। মৈথিলদের পুরুষ অস্তিত্ব বর্তমানে অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। একটি প্রসিদ্ধ বংশ গোত্রপরিবর্তন করিয়া “ব্রহ্মহা” খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। “গৌড়”-শ্রেণীতে রাষ্ট্রীয় পঞ্চগোত্র ব্যতীত “কৌশিক,” “স্বতকৌশিক” প্রভৃতি গোত্র মিশিয়া গিয়াছে। তদ্রূপ রাষ্ট্রীয় কুলপঞ্জীতে “তুলাই” ব্রাহ্মণদের সহিত সম্পর্ক অপবাদরূপে কীর্ণিত হইয়াছে। তুঘলক একটি বিশ্বয়কর প্রথা প্রচলিত ছিল যে, উপবীতধারী দুইজনের মধ্যে প্রথম পরিচয়কালে প্রশ্ন করা হইত—“আপনি ব্রহ্মকুল, না ক্ষত্রকুল?” ক্ষত্রিয়াচারী উপবীতধারী শূরবংশের ঐতিহ্য প্রশ্নটির মধ্যে লুকায়িত রহিয়াছে সন্দেহ নাই। তুঘলক শূরবংশ অন্ততঃ বহুল এবং বহুতর প্রাণে বিদ্যমান। একটি স্থানীয় প্রবাদ আছে,—“শূর শূর মাদার, তিনে তুঘলক আধার”। তন্মধ্যে রাজগোষ্ঠীসমূহ সম্ভ্রান্ত শাখা “আদিশূর” নামে পরিচিত, বাজে শাখার নাম “পদীশূর”।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পূর্বভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপের আয়ুষ্কাল স্থলতঃ ৫০০ বৎসর ধরা যায় (১৪০০—১৯০০ খ্রীঃ)। যে সকল মহাপণ্ডিতের গ্রন্থরচনা দ্বারা এই ভারতবিশ্ব্যাত মহাবিদ্যালয়ের চরম অভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় হইলেন “মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশ”। তাঁহার একটি টীকাগ্রন্থ—মূল চিন্তামণির উপর “মাধুরী”—ভারতের সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ইহাই তাঁহাকে এযাবৎ চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থকার মাত্রেই জীবনীর প্রধান উপকরণ দ্বিবিধ—তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজি ও পারিবারিক বিবরণ। এই দ্বিবিধ উপকরণই সংগ্রহ করা বর্তমান প্রগতির যুগে একান্তভাবে অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। এক দিকে নব্যজ্ঞানের চর্চা বাড়িয়া দেশ হইতে বিমুগ্ধপ্রায় হইয়াছে এবং মূল মাধুরীর কিয়দংশ পাঠ্য ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থ প্রয়োজন্যভাবে বিনষ্ট হইতেছে; অন্যদিকে তাহাদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা অদূরপর্য্যন্ত। অপর দিকে পিতৃপিতামহাদির নাম গ্রহণও এখন অনিষ্টবোধে পরিত্যক্ত এবং পারিবারিক কীর্তিকথা অতল জলে বিসর্জিত হইতেছে। ফলে, কতিপয় প্রবাদমূলক গল্পকথা ছাড়া বাদ্যলীর পূর্বতন মহামনীষীদের সম্বন্ধে প্রায়শঃ কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না এবং ঐ গল্পকথাই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া সাধারণ্যে ও শিক্ষিত সমাজে প্রচার লাভ করিতেছে। মথুরানাথ সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল কথা মুদ্রিত হইয়া বহুমূল হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই প্রবাদমূলক এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থের কষ্টসাধ্য অল্পসংখ্যান ও আলোচনা দ্বারা এখন নিশ্চিতভাবেই প্রতিপন্ন হয় যে, ঐ সমস্ত প্রবাদ অমূলক ও প্রমাণবিরুদ্ধ।^১

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বঙ্গদেশের ৪ জন মহানৈয়ায়িকের বিষয়ে নিম্নলিখিত দ্রোণকটি প্রচারিত হইয়াছিল :—

১। Ward সাহেবের “হিন্দু-বিষয়ক বিবৃতি” গ্রন্থের ২য় সংস্করণে মথুরানাথের উল্লেখ দুই হর (১৮২২ সনের পুনর্মুদ্রিত সং, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬, ২২৪ ও ৪৮৪)। তিনি মূলের টীকাকার ছিলেন, শিরোনামের ছাত্র ছিলেন এবং মনোয়ারাজের আশ্রিত নবদ্বীপনিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই তিনটি মাত্র কথা তন্মধ্যে পাওয়া যায়। ১ম সংস্করণে (১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৫) মাত্র ৫ জন নৈয়ায়িকের নাম লিখিত হইয়াছিল—গঙ্গেশ, রঘুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধর। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (*Notices of Sans. Mss.*, I, 1871, p. 288) মথুরানাথ সম্বন্ধে যে প্রবাদ লিখিয়াছেন, তাহাই বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে। নবদ্বীপ-মহিমা গ্রন্থে (১ম সং, পৃ. ৬৫-৬৬, ২য় সং, পৃ. ১৪৯-৫২) অমুরূপ প্রবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—মথুরানাথ ভবানন্দের গুরু ছিলেন, ইহাই পণ্ডিতসমাজে বহুল প্রচারিত প্রবাদ। একমাত্র বর্গত মহামহোপাধ্যায় ফণিকৃষ্ণ তর্কবাগীশ মহাশয় বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা দ্বারা মথুরানাথ সম্বন্ধে ঐর্নাদিক কথা কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন (জ্ঞানপরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৩-৬)। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমরা মথুরানাথ সম্বন্ধে গবেষণার প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

শ্রুণোপরি শুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীৰ্ঘিতৌ ।

সর্বত্র মধুরানাথী জাগদীশী কচিং কচিং ॥

অর্থাৎ নব্যজ্ঞানের সমস্ত আকরগ্রন্থের উপর মধুরানাথ সমীচীন টীকা রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । মধুরানাথ-রচিত গ্রন্থরাজি এ যাবৎ যাহা আবিস্কৃত হইয়াছে, তদ্বারা এক দিকে প্রমাণিত হয়, তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে জ্ঞানশাক্তচর্চার পরিসর কত দূর বিস্তৃত ছিল এবং অপর দিকে তাঁহার বিষয়কর বুদ্ধিকৌশল ও লেখনীশক্তির বলে তিনি কিরূপ এক বরেন্দ্র আসন অধিকার করিয়াছিলেন, সারস্বত ইতিহাসে যাহার তুলনা হয় কি না সন্দেহ ।

গ্রন্থাবলী : (১) ভক্তচিন্তামণিরহস্য : গদ্য-রচিত মূল ভক্তচিন্তামণি গ্রন্থের চারি খণ্ডের উপরই মধুরানাথ টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায় । কিন্তু “উপমান-খণ্ড”র পঠন-পাঠন চিরকাল অপ্রচলিত বলিয়া তদুপরি মাথুরী টীকা অজ্ঞাপি অনাবিস্কৃত রহিয়াছে । অল্প তিন খণ্ডের উপলভ্যমান টীকাংশ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (১২৫০-১৩৪০ সন) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া মূল সহ সোশাইটি হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । মধুরানাথের এই বিরাট টীকাগ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যিক ।

(ক) প্রত্যক্ষখণ্ড : ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মুদ্রিত হয়, তন্মধ্যে “মাথুরী” সন্নিকর্ষবাদ পর্য্যন্ত (পৃ. ৬৩৯) পাওয়া যাইতেছে । অবশিষ্টাংশের মাথুরী অমুদ্রিত রহিয়াছে । প্রারম্ভে পিতৃবন্দনাম্লোক দ্বারা তিনি মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন :—

ছায়াধুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিলসম্পত্তে : ।

তাভং ত্রিভুবনগীতং তর্কালঙ্কারমাদরামদ্বা ॥

অয়ং ভগবান্ রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার ত্রিভুবনগীত জনক “শ্রীরাম তর্কালঙ্কার”কে তুলনা করিয়া মধুরানাথ পিতৃভক্তির পরাকর্ষ্য দেখাইয়াছেন । শ্রীরামও তাঁহার সময়ে অতিপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এবং নব্যজ্ঞানের টীকাকার ছিলেন—তাঁহার বিবরণ প্রবন্ধান্তরে (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ১০২-৪) দ্রষ্টব্য । শ্রীরাম-রচিত ক্ষুদ্র একটি বাদগ্রন্থ সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—৩২ পত্রের শেষে পুস্তিকা এই :—“ইতি শ্রীমতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্য-শ্রীরামবিরচিতা যোগ্যাঙ্গুলক্লিঃ ।” এক স্থলে লীলাবতীপ্রকাশের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ।

(খ) অনুমানখণ্ড : ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এই গ্রন্থে মাথুরী বাৎপ্রকরণ পর্য্যন্ত (পৃ. ৯৮২) পাওয়া যায় । ঈশ্বরবাদের মাথুরী অপ্রাপ্য ও অমুদ্রিত রহিয়াছে । ইহার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পূর্ববৎ, কেবল একটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে । যথা,

আদীক্ষিকীপণ্ডিতমণ্ডলীষু সস্তাণ্ডবৈরধ্যয়নং বিনাপি ।

মহুস্তমেতৎ পরিচিন্ত্য ধীরাঃ নিঃশব্দমধ্যাপনমাতমুখবৎ ॥^২

২। দবদীপে মূলমাথুরীর অনুমান খণ্ডের একটি প্রতিলিপিতে আমরা মঙ্গলশ্লোক ও প্রারম্ভ বিভিন্নরূপ পাইয়াছি । যথা,

সনীরনীরম্যস্তাম্যঃমহুঃখল্লমলোচনং ।

বদবীবদন্তঃবন্দেঃবন্দাবনবিহারিণম্ ।

এই টীকাংশই মধুরানাথের অতিপ্রসিদ্ধ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার পঠন-পাঠন অত্যাপি ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচারিত আছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন পণ্ডিতসমাজের বহু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মাধুরীর এতদংশের স্থলে স্থলে “পত্রিকা” রচনা করিয়া বুদ্ধিকৌশল দেখাইয়াছেন। মধুরানাথের সময়ে অল্পমানখণ্ডের চর্চা কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছিল, গ্রন্থারম্ভে তাহার সুস্পষ্ট সূচনা আছে—“যদ্ব্যপীদং বহুভিবহু বহুধা চক্ৰিতং জায়তে চ কৈশিৎ সামাজ্যতো হেত্বাতাসত্ত্বং তথাপি” ইত্যাদি। এই সম্বন্ধে মধুরানাথ শিরোমণির উপর কটাক্ষ রহিয়াছে বলিয়া অনেকে লিখিয়াছেন (R. L. Mitra, *Notices of Sans. Mss.* Vol. I, p. 286)। তাহা নিতান্ত অমূলক; শিরোমণির সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় সকলেই দীর্ঘিতি ব্যতীত মূলের উপরও টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন—মধুরানাথের পরবর্তী জগদীশ-গদাধরও করিয়াছেন। তদ্বারা কেহই সম্প্রদায়প্রবর্তক শিরোমণির সমকক্ষতা বা বিপক্ষতা লাভের চুরাশা পোষণ করেন নাই। এতদ্বিষয়ে নবদ্বীপে যে প্রবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচারিত হইয়া আসিতেছে (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৭-৮ প্রভৃতি), তাহা নিশ্চয়্যাপন্ন মাত্র। এই গ্রন্থের দুই স্থলে “পিতৃচরণে”র ব্যাখ্যা মধুরানাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১৬৩-৪ ও ২৯৪-৫) এবং প্রথম স্থলে খণ্ডনও করিয়াছেন। অল্পমান হয়, শ্রীরাম মূলেরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

(গ) শব্দখণ্ডঃ ইহার প্রথমার্শ (পৃ. ৫২৫) ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষার্শ (পৃ. ৮৬৬) ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আত্মশক্তিবাদ প্রকরণ হইতে (পৃ. ৫৫৬) মাধুরী অপ্রাপ্য বলিয়া মুদ্রিত হয় নাই। শব্দখণ্ডের মাধুরীর আরম্ভ শ্লোকত্রয় অবিকল অল্পমান-খণ্ডের জায়।

এই তিন খণ্ড টীকার উপলব্ধাংশ মূল বাদ দিয়া অন্যান্য ২,০০০ মুদ্রিত পৃষ্ঠাব্যাপী এবং মোট গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৩০,০০০, অর্থাৎ মহাত্মারতের এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে। বিলুপ্তাংশ ধরিত্রী আরও বেশী হইবে।

(২) মধুরানাথ পক্ষধর মিশ্রের “আলোক” টীকার উপরও “রহস্ত” নামক উপটীকা রচনা করিয়াছিলেন। আলোকের পঠন-পাঠন বহু কাল হইল নবদ্বীপে এবং পক্ষধর মিশ্রের স্বকীয় সমাজ মিথিলায়ও বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং “মিশ্রমাধুরী”র প্রতিলিপি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। আমরা নানা স্থানে ইহার খণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দেখিয়াছি। তদ্ব্যতীত শব্দালোকমাধুরীর প্রতিলিপি অনেকটা অপ্রাপ্য—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে (৫২৮ সংখ্যক দর্শনের পুথি), লণ্ডনে (*I. O. Cat.*, I. p. 680. পত্রসংখ্যা ২৩৮) এবং অল্পত্র ইহার প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। প্রারম্ভ এই :—

শ্রীমতা মধুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা।

বিশদীকৃত্য বর্ণ্যন্তেহুমানখণ্ডকটিকাঃ।

প্রত্যক্ষ নিরূপিতমিদানৌমধুরানং নিরূপণীয়ম্...। ইত্যাদি

লক্ষ্য করিতে হইবে, অবতরণিকার প্রচলিত পাঠে আরম্ভে যে পক্ষধরক বাক্য রহিয়াছে, তাহা এই পুথিতে নাই।

কুক্ষিতাধরপুটেন পুরয়ন্ বংশিকং প্রচলদমূলিপঙ্ক্তিঃ ।

মোহয়ন্ নিখিলবামলোচনাঃ পাতু কোপি নবনীরদচ্ছবিঃ ॥

শ্রীমতা মধুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা ।

শব্দমণি পরিচ্ছেদালোকো ব্যাখ্যায়তে ক্ষুটম্ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রত্যক্ষালোকমাধুরীর দুইটি অতিহৃদয়ত পুস্তিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (৩২২ খ-গ সংখ্যক সংস্কৃত পুষ্টি, পত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৯৪+৩২ ও ২৮)। প্রথমটি অল্পখ্যাতি-প্রাপ্ত পুস্তি গিয়াছে। ইহার প্রারম্ভে একরূপই, কেবল শেষ পঙ্ক্তির পাঠ যথোচিত পরিবর্তিত। যথা,—বিশদীকৃত্য দর্শাস্তে “প্রত্যক্ষালোকফলিকাঃ।” অমুমানালোকমাধুরীর প্রতিলিপি লণ্ডনে রক্ষিত আছে (*I. O. Cat.*, I. p. 680.), যাত্র উত্তরখণ্ডের (উপাধিবাদ হইতে দৈববাদ পর্যন্ত) পত্রসংখ্যাই ৭৩+১৫৫। সমগ্র গ্রন্থের আয়তন সহজেই অনুমেয়। স্তরায়ঃ মিশ্রমাধুরীও মূলমাধুরীর জায় বিপুলায়তন বটে এবং এযাবৎ আবিষ্কৃত ইহার তিন খণ্ডের খণ্ডিতাংশ একত্র করিলেই গ্রন্থসংখ্যায় অন্ত ৩০,০০০ হইবে। বিলুপ্তাংশ বোজনা করিলে সমগ্র টীকার পরিমাণ মহাভারতের অর্দ্ধাংশ হওয়া অসম্ভব নহে।

(৩) মধুরানাথ, শিরোমণির প্রচলিত ৮টি গ্রন্থের উপরই “রহস্য” নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষদীপ্তি, পদার্থখণ্ডন ও নঞবাদেয় মাধুরী আমরা অজ্ঞাপি কোথাও দেখি নাই। সমুচিত অনুসন্ধান করিলে তাহা হুত্ৰাপ্য হইবে না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে “অমুমানদীপ্তিমাধুরী”র পূর্বখণ্ডের (সামান্যলক্ষণাপ্রকরণ পর্যন্ত) একটি প্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (১০৩৮ সংখ্যক সংস্কৃত পুষ্টি, পত্রসংখ্যা ৪৩+২৪৩, মধ্যে ১০০-১২১ পত্র নাই)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পূর্বখণ্ডের একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (২০২৮ সংখ্যক পুষ্টি, পত্রসংখ্যা ২৫০)। পরিষদের পুষ্টির স্থলে স্থলে তেজুগু অক্ষরে পার্শ্বটীকা আছে। দীপ্তির এই টীকা পরিমাণে জাপদীপ্তি অপেক্ষা অনেক বড়, প্রায় দেড়—পূর্বখণ্ডের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ১০,০০০। মধুরানাথের এই টীকা নৈমারিকসমাজে কেন প্রচারলাভ করিল না—এই প্রশ্নের কোন সন্তুস্তর পাওয়া যায় না। ইহার প্রারম্ভে “কুক্ষিতাধর” শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয় :—

জগদগুরোঃ শ্রীরামস্ত চরণৌ মূগ্ধি ধারয়ন্ ।

তৎসুতো মধুরানাথো দীপ্তিং ক্ষুটয়ত্যমুম্ ॥

(৪) গুণদীপ্তিমাধুরীর প্রতিলিপি অনেকটা হুত্ৰাপ্য—প্রায় সমস্ত পৃষ্ঠাশালায়ই ইহা রক্ষিত আছে। ইহার প্রারম্ভশ্লোক অবিকল অমুমানদীপ্তিমাধুরীর জায়। ইহার গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ১০,০০০ বটে। উদয়নাচাৰ্যের “গুণকিরণাবলী” এবং তদুপরি বর্ধমানোপাধ্যায়কৃত “প্রকাশ” নব্যজ্ঞানের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে নবদীপে এবং অজ্ঞাত খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নিবিড়ভাবে টীকা-টিপ্পনী সহযোগে অসীত হইত।

(৫) বৌদ্ধাধিকারদীপ্তিমাধুরী : ইহা অত্যন্ত হুত্ৰাপ্য। আমরা এক স্থলে ৬

পত্রের একটি পুঁথি দেখিয়াছিলাম—শেষে লিখিত আছে, “ইত্যন্তঃ প্রচরন্তী বৌদ্ধাধিকার-শিরোমণেশ্বরী”। মথুরানাথ সম্পূর্ণ গ্রন্থেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

(৬) **লীলাবতীদীপ্তিমাধুরী** : ইহার প্রতিলিপিও একাধিক পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে এবং খণ্ডিত অংশমাংশ বহু স্থলেই সূত্রাপ্য। আরম্ভে “কুক্ষিতাধর” মঙ্গলমোকের পর আছে :—

শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশ-বীমতা।

ভাবঃ প্রকাশ্যন্তে চারু লীলাবত্যাঃ শিরোমণেঃ ॥

বলা বাহুল্য শ্রীবল্লভাচার্যের “জ্ঞানলীলাবতী” প্রকরণ এবং তদুপরি বর্ধমানোপাধ্যায়ের “প্রকাশ” নব্যভাষ্যের অবশ্যপাঠ্য আকরগ্রন্থরূপে পরিগৃহীত হইত।

(৭) **আখ্যাতবাদটীকা** : শিরোমণির আখ্যাতশক্তিবাদ সুবিস্তৃত “মাধুরী” টীকা সহ সোসাইটি হইতে শব্দধণ্ডের ২য় ভাগের শেষে (পৃ. ৮৬৭-১০০২) মুদ্রিত হইয়াছে।

(৮) **দ্রব্যকিরণাবলীটীকা** : মথুরানাথ উদয়নাচার্য্যকৃত মূল দ্রব্যকিরণাবলী গ্রন্থের বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন (“দ্রব্যান্তাশেষকক্ষিকাঃ”)। নানা স্থানে ইহার বহু প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু সবই খণ্ডিত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইহার যে প্রতিলিপি আছে (১০২ সংখ্যক পুঁথি, পত্রসংখ্যা ১০২), তাহা পৃথিবীগ্রন্থের পর কিয়দংশ পর্যন্ত গিয়াছে। ভূঃখের বিষয়, বর্ধমান নৈমিত্তিকগণ মুক্তিবাদাদি নানাবিধ বিষয়ে এতদগ্রন্থে মথুরানাথের অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার বিন্দুমাাত্রও অবগত নহেন। আমরা উদাহরণস্বরূপ একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিতেছি :—(২১।১.পত্র, অম্বদীয় পুঁথির ২৪।১ পত্র) অশরীরমিতি—বাব ইতি সম্বোধনে সম্বোধ্য মৈত্রেয়ী...মণিকৃতস্ত বাবসম্বন্ধমিতি যঙ্জুকি, তথাচ শরীরযোগং বিনা পুনঃ পুনঃ সম্বন্ধিত্যর্থ ইত্যাহঃ। তদসং তথা সতি বাবসম্বন্ধমিতি প্রয়োগঃ ত্রাং “অভ্যাস্তদস্তিরনকার” ইতি নকারলোপাৎ তস্মাৎ কল্পতরুরকার-সম্বন্ধোক্তব্যার্থ্যেব জ্ঞায়সী।

বুঝা যায়, মথুরানাথ পাণিনিব্যাকরণে অধীতী ছিলেন না—উদ্ধৃত সূত্র কলাপ-ব্যাকরণের (চতুর্থেয়ের ১০৬ সূত্র) বটে। আর, কল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ উদাহরণ পড়া ছিল।

(৯) **গুণকিরণাবলীটীকা** : উদয়নাচার্য্যের মূল গুণকিরণাবলীর উপরও মথুরানাথ বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নানা স্থানে পাওয়া যায়। আরম্ভে “কুক্ষিতাধর” শ্লোক, তৎপর “শ্রীমতা” ইত্যাদি শ্লোক (শেবার্দ্ধ “বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে গুণগ্রন্থস্ত ফক্ষিকাঃ”), তৎপর “আধীক্ষিকী-পণ্ডিতমণ্ডলীষু” প্রভৃতি শ্লোক ও তৎপর নিম্নলিখিত গর্কোক্তি :—

মহন্তগ্রন্থং ববিচিন্ত্য যজ্ঞাৎ হম্পভেরপ্যভ্যবোধয়েতৎ।

শাস্ত্রং যথা কক্ষপদারবিন্দুধ্যানং বিনা সোহপি বিয়ং ন ধন্তে ॥

(১০) **বৌদ্ধাধিকারবিস্তৃতি** :—অর্থাৎ উদয়নাচার্য্যকৃত “আত্মতত্ত্ববিবেক” প্রকরণের

উপরও মধুরানাথ বিত্তীর্ণ টাকা রচনা করিয়াছিলেন (“বৌদ্ধাধিকারবিস্তৃতিবিশদীকৃতঃ রচ্যতে”) । সোসাইটি হইতে প্রকাশিত সটীক গ্রন্থে ইহার কিয়দংশ মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে (৩৮ পৃষ্ঠার পর মাধুরী টাকা নাই), অথচ মুদ্রিত টাকা-চতুষ্টয়ের মধ্যে মাধুরীই আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ।

(১১) লীলাবতীমাধুরী :—শ্রীবল্লভাচার্য্যকৃত “জ্ঞানলীলাবতী” প্রকরণের মাধুরী টাকাও খণ্ডিতাকারে বহু স্থানে পাওয়া যায় । কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ৪৫৫ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য (পত্রসংখ্যা ৫৮)—প্রারম্ভে আছে—“বিবিচ্যতে চ সিদ্ধার্থো লীলাবত্যাং বিশেষতঃ ।”

(১২) দ্রব্যপ্রকাশটীকা : বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত “দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশে”র মাধুরী টাকা অত্যন্ত চূড়ান্ত । আমরা কতিপয় পত্র মাত্র এক স্থলে দেখিয়াছি ।

(১৩) ভূগপ্রকাশবিস্তৃতি : বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত “ভূগপ্রকাশবিস্তৃতিঃ ক্রিয়তে । বহুবাং মুদে”) । ইহার উপলভ্যমান অংশ হইতে বুঝা যায়, ইহাও আয়তনে বিত্তীর্ণ ছিল ।

(১৪) লীলাবতীপ্রকাশটীকা : বর্দ্ধমানোপাধ্যায়কৃত জ্ঞানলীলাবতীপ্রকাশের মাধুরী টীকার কিয়দংশও নানা স্থানে পাওয়া যায় (“লীলাবত্যাঃ প্রকাশোহুৎ বিশদীক্রিয়তে ময়া”) । কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে একটা খণ্ডিতাংশ আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (পত্রসংখ্যা ৩১, চৌধাধা সংস্করণের মাত্র ৫৩ পৃ. পর্য্যন্ত) । ইহাও বিত্তীর্ণ ব্যাখ্যা বটে ।

বিজ্ঞান গ্রন্থ : (১৫) গৌতমসূত্রবিস্তৃতি : নবদ্বীপগৌরব শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহে একটা পুস্তকতালিকার মধ্যে আমরা (জগদীশরচিত) “ভূগবিস্তৃতি” ও “গৌতমসূত্রমাধুরী”র উল্লেখ পাইয়াছি । উভয় গ্রন্থই এ যাবৎ অনাবিস্কৃত রহিয়াছে ।

(১৬) সুপুস্তকবাদ : আখ্যাতবাদের টীকার দুই স্থলে (পৃ. ২৫৩-৪) মধুরানাথ রচিত “সুপুস্তকবাদ” গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা অত্য়পি আবিস্কৃত হয় নাই ।

সম্মিষ্ট গ্রন্থ : মঞ্জুরীটীকা : কান্দীর সরস্বতীভবনে জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণির রচিত জ্ঞানসিদ্ধান্তমঞ্জুরীর একটা টীকাংশ আমরা দেখিয়াছি (জ্ঞানবৈশেষিক, ২০২ সংখ্যক পুঁথি, মাত্র ৬ পত্র) । ইহার কোন মঙ্গলাচরণ নাই । পার্শ্বে সাক্ষেতিক পরিচয়লিপি আছে “ম-টা-ম” এবং পরবর্তী হস্তাক্ষরে লিখিত আছে “মধুরানাথী” । দুই স্থলে দীর্ঘিতিকারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে—“দৈবরাশ্মিনি মহত্ত্বপরিমাণস্ত দীর্ঘিতিকুলসম্মতস্য” (১ পত্র), “বিশিষ্টাভূতবৎ প্রত্যেক বিশেষণধিযো হেতুস্মিতি দীর্ঘিতিকুলতো বদন্তি” (৩২ পত্র) । ইহা মধুরানাথ-রচিত হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না ।

মহিমঃস্তবটীকা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় মহেশ জ্ঞানরত্নের সংগ্রহে (৬৮৯ সংখ্যক পুঁথি) মহিমঃস্তবের খণ্ডিত একটা টীকা আছে (পত্রসংখ্যা ৬, ত্রয়োদশ স্লোকের ব্যাখ্যাংশ পর্য্যন্ত) । ইহাতেও কোন মঙ্গলাচরণ নাই, কিন্তু পার্শ্বে সুস্পষ্ট পরিচয়লিপি আছে “মাধুরী” । গ্রন্থমধ্যেও নৈমায়িকের ভাষা পরিদৃষ্ট হয় । গ্রন্থারম্ভ যথা:—

নহু শুণবস্বেন কীর্তনং স্তোত্রং শুণেন বিমুক্তান্মনো ভগবতো হুতিং কচ্চিন্ন কয়োতি ।
অতঃ স্তোতব্যাপরিস্জ্ঞানে স্তোতেরসস্তবিস্বমাশঙ্ক্য পরিজিহীষুর্গাহ—মহিম ইতি ।

এ স্থলেও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না । আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের নিকট পৃথক্ আর একটি ক্ষুদ্রতর মহিমঃ-স্তবটীকা আছে, পত্রসংখ্যা ১০, কিন্তু প্রথম ২ পত্র নাই । পার্শ্বে সুস্পষ্ট পরিচয়লিপি আছে “মহিমঃ মাধুরী” এবং শেষে পুণ্ডিকা আছে “ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীমথুরানাথতর্কবাগীশকৃতা মহিমঃস্তবকৌমদী সমাপ্তা” ॥ (লিপিকাল ১৭৩৪ শক) । এই টীকা প্রোঞ্জল হইলেও মহানৈয়ায়িক মথুরানাথের লিপিকৌশলবর্জিত এবং নিশ্চিতই অপর কোন মথুরানাথ-রচিত ।

পাণিগ্রন্থাদিবিবেকঃ—রাধেজ্জলাল মিত্র মথুরানাথ-রচিত স্মৃতিশাস্ত্রের এই গ্রন্থের একটি খণ্ডিত প্রতিলিপির সন্ধান পার্হায়াজিনেন (L. 3164, পত্রসংখ্যা ২১) । আরম্ভে অবিকল “কৃষ্ণিতাধর” শ্লোক ও তৎপর “শ্রীমতা” প্রভৃতি শ্লোক (শেষাঙ্কঃ— “পাণিগ্রন্থাদিকৃত্যানাং বিবেকঃ ক্রিয়তে ময়া”) দেখিয়া ইহা নৈয়ায়িক মথুরানাথের রচনা বলিয়াই মনে হয় । কলিকাতায় সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে এই গ্রন্থেরই একটি সুবৃহৎ প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (পত্রসংখ্যা ২১২, মধ্যে ৭-২৩ পত্র নাই) । ইহাতে বহু গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম তুলিয়া দিতেছিঃ—নারায়ণোপাধ্যায় (৪১১ পত্র), নির্ণয়কার (২৬১২—নির্ণয়কৃতস্তম্ব মকরহো বদা জীবঃ...), ধনা (৩১২, ৪২১২, ১৬১১), জ্যোতিঃশিরোমণি (৫৪১), জ্যোতিঃকৌমুদ্যং রায়মুটঃ (৬৬১, ১৭৬২), সৌভরি (৬৭১), দীপিকাটীকা (রাঘবাচার্য্যকৃত ১০৩২, ১৬৬-৭), জ্যোতিস্তত্ত্ব (১০৩২, ১০৫১), আর্ষভট্টাচার্য্য (১১১১), জ্যোতীরঙ্গ (১১০), বাস্তুনির্ণয়ে রত্নমালায়াং (১২০১), শ্রাদ্ধবিবেকটীকায়ামাচার্য্যচূড়ামণ্যাদেঃ (১৪৭২) ।

রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্ব ১৪৮০ শকাব্দের (১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের) পরে রচিত । ঐ সময়ে নিঃসন্দেহ মথুরানাথ জীবিত ছিলেন । নৈয়ায়িকপ্রবর সমকালীন আর্শের নাম সসম্মানে উল্লেখ করিবেন, মনে হয় না । আর, নির্ণয়কার যদি গোপাল ভ্রাম্যপঞ্চানন হন, তবে নিশ্চিতই এই মথুরানাথ পৃথক্ ব্যক্তি । গোপাল নৈয়ায়িক মথুরানাথের পূর্ববর্তী—১৫২৫ শকাব্দে (১৬১৩ খ্রী.) তিনি “অশৌচনির্ণয়” রচনা করেন (L. 3188. “শাকে শরৈবহ্নি-শরেন্দ্রুমানেন”) । এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালার আর্ষভট্টসমাজে মথুরানাথ তর্কবাগীশ নামে একজন স্মৃতিগ্রন্থকারের নাম প্রচারিত ছিল । কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কার “প্রায়শ্চিত্তসারসংগ্রহ” গ্রন্থে তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (১৭৭৪ শকের সংস্করণ, পৃ. ২৮) ।

স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় “আমুদায়ভাবনা” নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থ নৈয়ায়িক মথুরানাথরচিত বলিয়া ধরিয়াছেন (J. A. S. B., 1915, p. 278) । কিন্তু তাহা বোধ হয় পৃথক্ ব্যক্তির রচনা, যদিও আরম্ভশ্লোক হইতে তাহা বুঝা কঠিন (L. 2241, পত্রসংখ্যা ১২) :—

শ্রীমতা মথুরানাথ-তর্কবাগীশধীমতা ।

বিশদীকৃত্য দর্শ্যস্তে আয়ুর্দায়স্ত ভাবনাঃ ॥

মৌলিক গ্রন্থ : পরিশেষে আমরা মথুরানাথের বিরাট মৌলিক গ্রন্থ সিদ্ধান্তরহস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া তাঁহার গ্রন্থপঞ্জী সমাপ্ত করিতেছি । তাঁহার বহু টীকাগ্রন্থমধ্যে স্বরচিত সিদ্ধান্তরহস্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (অমুমানখণ্ড, পৃ. ৯৮, ১২৯, ২৭১, ২৮৪ : দ্রব্যকিরণাবলীরহস্ত ৪১২, ৬৭২ পত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) এবং বুঝা যায়, মথুরানাথ স্বয়ং তাঁহার ঐ বিচারমূলক বিপুল গ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে আস্থা সম্পন্ন ছিলেন । নবদ্বীপের দুই জন প্রধান নৈয়ায়িক “সিদ্ধান্তরহস্ত” নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—রামভদ্র সার্কভৌম ও মথুরানাথ । পদার্থধণ্ডনের টীকার রামভদ্র এক স্থলে স্বরচিত ঐ গ্রন্থ হইতে দীর্ঘ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন (কাম্বীর সং, পৃ. ৯৬-৭, ‘অস্বদীয় পুথির ৭২ পত্র) । কিন্তু রামভদ্রী সিদ্ধান্তরহস্ত অত্মাপি কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না । নবদ্বীপে জগদীশ-বংশধর শ্রীবৃত্ত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থের গৃহে একটি পুস্তকস্থতির মধ্যে “সিদ্ধান্তরহস্ত মাধুরী”র উল্লেখ দেখিয়াছি এবং আন্তরহিত নামহীন একটি গ্রন্থও দেখিয়াছি, যাহা মাধুরী সিদ্ধান্তরহস্ত বলিয়া আমাদের অমুমান হয়—মুর্ন্তজ্ঞাতিনিরাকরণ (১২৪১ পত্র), দ্রব্যত্বজ্ঞাপ্রমাণ (১৩০১), গুণত্বজ্ঞাতিখণ্ডন (১৩১১) প্রভৃতি প্রকরণ এবং “ভট্টাচার্য্যাদিসকলপ্রামাণিকসিদ্ধান্ত” (১২২২) প্রভৃতি উক্তি ঐরূপ স্থচনা করে । কোলকাতা সাহেব মনোহর বঙ্গাক্ষরে লিখিত অজ্ঞাতকর্তৃনাম “সিদ্ধান্তরহস্ত” গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পত্রসংখ্যা ৩৪৫ এবং প্রকরণসংখ্যা অন্যান ৬০ (অধুনা লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত :—*I. O. Cat.* I, pp. 644-5, No. 680) । ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মাধুরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে মনে হয় । কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে নাগরাক্ষরে লিখিত একটি “সিদ্ধান্তরহস্ত” আছে, পত্রসংখ্যা ২-৩৬২ । শেষ প্রকরণ “পাকজবিচাররহস্ত” । সৌভাগ্যবশতঃ ইহাই মাধুরী বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ হয় ; কারণ, মধ্যে এক স্থলে (১৮৮২) প্রারম্ভাংশ পাওয়া যাইতেছে । প্রথম শ্লোক “হুঙ্কিতাধর” প্রভৃতি । তৎপর,

শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশধীমতা ।

রহস্তঃ সর্বশাস্ত্রাণাং সিদ্ধান্তানাং প্রচক্ষ্যতে ॥

আধীক্ষিকীপণ্ডিতমণ্ডলীষু সস্তাণ্ডবৈরধ্যয়নং বিনাপি ।

মদীয়সিদ্ধান্তরহস্তমৈতদ্বিলোক্য বীরাঃ সকলান্ জয়েযুঃ ॥

বুধবরনিকরাগ্রে জ্ঞাপনেহধ্যাপনে বা

বিশ (৭) ইতরনিবন্ধং তর্কবন্ধং মদীয়ং ।

সততমনবলোক্য প্রায়শো বাগধীশো

ভবতি ভুবনমধ্যে বাবদুকোপি মুকঃ ॥

এই প্রতিলিপি অনেকটা বিপর্যস্ত হইয়া আছে । অনেক প্রকরণের শেষে সংখ্যানির্দেশ আছে—চিহ্নরূপস্পর্শখণ্ডনং । ৬৬ (৩০৮২ পত্র) প্রভৃতি । মোট প্রকরণের সংখ্যা ৭৫

হইতে বেশী। কাশী, চৌধাড়া হইতে প্রকাশিত “বাদবারিধি” গ্রন্থের ২য় খণ্ডে একটি অজ্ঞাতকর্তৃনাম “নিত্যসুখবাদ” মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১৪৮ দৃষ্টব্য)। ইহা বস্তুতঃ মাথুরী সিদ্ধান্তরহস্তের ৭৫ সংখ্যক প্রকরণ “ঈশ্বরে নিত্যসুখব্যবস্থাপনং” (৩৩৭।২-৩৪১।২ পত্র)। ইহার শেষে অতি চূর্ণিত এক নৈয়ায়িকপ্রবরের সন্দর্ভ মথুরানাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন (বাদবারিধি, পৃ. ১৪৮, পুথির ৩৪১।২ পত্র—“পরে তু...ইত্যাচ্ছ:”); উদ্ধৃত সন্দর্ভের শেষে অজ্ঞাতনামা নৈয়ায়িক স্বরচিত একটি টীকার নামোল্লেখ করিয়াছেন—“অধিকং শব্দমণ্ড্যালোকবিস্তারে বিবেচয়িষ্যামঃ”। বর্তমানে এই টীকাগ্রন্থ ও তাহার রচয়িতার নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে চিরবিগুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকরণে মথুরানাথ নিত্যসুখবাদী রঘুনাথ শিরোমণির নাম করেন নাই; ষাঁহার সন্দর্ভ সাদরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনি শিরোমণির পূর্ববর্তী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন নৈয়ায়িক তর্কশাস্ত্রের বাদমালা পৃথক্ গ্রন্থে সুনিপুণভাবে বিচার করিয়া গিয়াছেন। শিরোমণির “পদার্থখণ্ডন” এ বিষয়ে একটি পথিপ্রদর্শক। গদাধরের গুরু হরিরাম তর্কবাগীশের বাদগ্রন্থসমূহ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ভারতের সর্বত্র প্রচার লাভ করে এবং ফলে অজ্ঞাত প্রাচীনতর ও সমকালীন তাদৃশ গ্রন্থ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কণাদের “তর্কবাদার্থমঞ্জরী,” রামভদ্র ও মথুরানাথের “সিদ্ধান্তরহস্ত,” জগদীশের “বিচার”সমূহ এবং ছায়বাগীশের “বাদতত্ত্ব” প্রভৃতি এই ভাবে ক্রমশঃ চুপ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে হরিরামের রচনাও অনেক স্থলে গদাধরের বাদগ্রন্থের প্রসিদ্ধি-হেতু বিরলপ্রচার হইয়াছে।

মথুরানাথের অসামান্য লেখনীশক্তি অভিজ্ঞ কারিকাকার “সর্বত্র মথুরানাথী” পদে ব্যক্ত করিয়াছেন। নব্যজ্ঞানের উৎপত্তি উদয়নাচার্য্য হইতে এবং প্রথম পরিণতি গঙ্গেশের মণিগ্রন্থে। একমাত্র মণি, মণ্যালোক ও মণিদীপ্তির সমগ্র মাথুরীই একযোগে লক্ষ গ্রন্থের অনেক উপরে যাইবে। অনুমান হয়, মথুরানাথের বাবতীয় গ্রন্থের পরিমাণসমষ্টি প্রায় ৩-৪ লক্ষ শ্লোক হইবে। আমরা দেখিয়াছি, একজন দক্ষ লিপিকার (অক্ষয়রাম শর্মা) ছয় বৎসরে (১৭১২-১৭ শকাব্দে) সমগ্র মহাভারত (হরিবংশ বাদ দিয়া) নকল করিয়াছিলেন। ব্যাসদেবের সরল রচনার স্থলে সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ চূর্ণ মাথুরী গ্রন্থমালা নকল করিতে একজন লেখকের প্রায় ২০-২৫ বৎসর লাগিবে অর্থাৎ এক জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশই অতিক্রান্ত হইবে। মথুরানাথের প্রত্যেক রচনায় বহুতর পূর্বতন গ্রন্থকারের মতবাদ ও সন্দর্ভ উদ্ধৃত ও বিচারিত হইয়াছে। তাহার সম্যক আলোচনার দ্বারা মথুরানাথের পাণ্ডিত্যের পরিসর ও গভীরতা নির্ণয় করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা একজন গবেষকের পক্ষে অসম্ভব। নব্য জ্ঞানের প্রচার জগতের সারস্বত ইতিহাসের এক অভুলনীয় অধ্যায় এবং তদ্বিষয়ক বিরাট সাহিত্যে মথুরানাথের লেখনীপ্রসূত গ্রন্থরাজির আয়তন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সন্দেহ নাই।

মথুরানাথ সম্বন্ধে অমূলক প্রবাদ

মথুরানাথ (ও তৎপিতা শ্রীরাম) রঘুনাথ শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন, ইহাই পণ্ডিতসমাজের চিরন্তন প্রবাদ এবং শতাব্দিক বৎসর যাবৎ নানা গ্রন্থে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া এই প্রবাদ এত দূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ও তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধে (*Sarvasatī Bhavana Studies* Vol. V, p. 185) তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ধরিয়াছেন। পাজী ওয়ার্ড সাহেব সর্বপ্রথম এক স্থলে (*The Hindoos*, 1822 ed., Vol. II, p. 6 fn.) শিরোমণির অন্ততম ছাত্র বলিয়া মথুরানাথের উল্লেখ করেন ('one of Shiromune's scholars')—এই তথ্য তিনি তৎকালীন পণ্ডিতসমাজের নিকট জানিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। শব্দকল্পদ্রুমে ("জ্ঞায়" শব্দ দ্রষ্টব্য) নব্যজ্ঞায়ের গুরুপরম্পরায়স্থলে তাহাই লিখিত হইয়াছে। নবদ্বীপনিবাসী কাস্তিচন্দ্র রাতা প্রাচীনদের মুখে অবগত হইয়া যে সকল স্থানীয় প্রবাদ সুলিখিত "নবদ্বীপমহিমা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন, তাহা স্বভাবতই প্রামাণিক বলিয়া পরিগৃহীত হয়। মথুরানাথ সম্বন্ধে প্রবাদ এই গ্রন্থে দ্রষ্টব্য (১ম সং, পৃ. ৬৫-৬৯; ২য় সং, পৃ. ১৪৯-৫২)। শিরোমণির ছাত্রত্ব-যুক্ত প্রবাদই মনোহর কাহিনীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, বিচারশীল প্রমাণপরতন্ত্র পণ্ডিতসম্প্রদায় লোকপ্রবাদের ভক্ত হইয়া মূল গ্রন্থোক্ত অকাট্য প্রমাণও উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত না হইয়াও অপূর্ণ গবেষণাশক্তি দেখাইয়া সর্বপ্রথম মথুরানাথ সম্বন্ধে চিরন্তন প্রবাদের উপর সন্দেহপোষণ করেন (*J. A. S. B.*, 1915, p. 278)। পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল মাত্র মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় কষ্টসাধ্য গবেষণার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, মথুরানাথ রঘুনাথ শিরোমণির নিকট পড়েন নাই এবং তাঁহার পিতা "শ্রীরাম তর্কালঙ্কারও শিরোমণির ছাত্র নহেন" (জ্ঞায়পরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা পৃ. ২৩-৬)। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সিদ্ধান্তের পরিপোষক অতিরিক্ত প্রমাণাবলী আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। (১) মথুরানাথ "দীর্ঘিতিকার" ও "ভট্টাচার্য্য" পদোন্মেষেই শিরোমণির মত ও সম্ভবতঃ বহুতর স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি বৃণাকরেও সূচনা করেন নাই যে, দীর্ঘিতিকার তাঁহার সাক্ষাৎ অধ্যাপক ছিলেন।

(২) কতিপয় বিরল স্থলে মথুরানাথ "গুরুচরণাঃ" বলিয়া স্বকীয় অধ্যাপকের সম্ভর্ষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, মূল মাধুরীর অল্পমানধণ্ডের উপাধিবাদে (সোসাইটি সং, পৃ. ৩৪৮) এবং শব্দধণ্ডের বিধিবাদে (ঐ, পৃ. ১২, ৩৪, ৫৮, ৬৭ ও ১০৪)। এই সকল স্থলে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় যে, এই গুরুচরণ শিরোমণি নহেন।

(৩) অল্পমানদীর্ঘিতির মাধুরী স্বল্পমাত্র আলোচনা করিলেই পরিগ্রহ করা যায় যে, মথুরানাথের পূর্বেই শিরোমণির উপর বহুতর টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়া এক বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দীর্ঘিতির পাঠনির্ণয়ে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রকরণে বহু পাঠান্তর উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে এবং বহু পাঠ "প্রামাণিক"

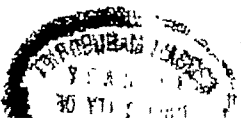
বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে (পরিষদের পুথি ৫৫২, ১৩৩১, ১৬২২, ১৭০১ ও ১৯৩১ পত্র দৃষ্টব্য)। পূর্ববর্তী টীকাকারদের মধ্যে “প্রাকঃ” (ঐ, ১২৪১, ১৩৮২, ১৫৮১, ১৬২১, ১৬৩১) ও “নব্যাস্ত” (১২৫১, ১৬৮২) পদ প্রয়োগ দ্বারা কালঘটিত পার্থক্য নির্দিষ্ট হওয়ায় শিরোমণির সহিত মথুরানাথের কালব্যবধান স্ক্রুশিষ্য-সম্পর্কের একান্ত অসম্ভবতাই প্রমাণিত করে। বিশেষব্যাখ্যাপ্রকরণের এক স্থলে পাঠভেদ ও পূর্বতন একটি অদীর্ঘ ব্যাখ্যাবচন ঋণিত হইয়াছে (১৬৬১-১৬৭১ পত্র)। যথা, “সাম্প্রদায়িকাস্ত পূর্বে উপাধ্যায়-প্রবেশেনেতি বাবদিত্যবাবহমানঃ পাঠঃ...ইত্যাঃ, তদসং”। এখানে ‘সম্প্রদায়’ বলিতে অভিপ্রেতঃ গ্রন্থকার শিরোমণির সাক্ষাৎ শিষ্যপরম্পরায় ব্রূয় এবং মথুরানাথের ভাষা হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, তিনি স্বয়ং এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহার পক্ষে শিরোমণির সাক্ষাৎ ছাত্র হওয়া স্তব্ধতাই একান্তভাবে অসম্ভব। পরবর্তী অতএব-চতুষ্ঠয় প্রকরণের এক স্থলে পর পর পূর্বতন ব্যাখ্যাচতুষ্ঠয় উদ্ধৃত ও দুই স্থলে ঋণিত হইয়াছে (১৬৮২-১৬৯২ পত্র)। প্রথম ব্যাখ্যাই হইল “ইতি সম্প্রদায়ঃ” এবং “তদসং” বলিয়া তাহা ঋণিত হইয়াছে।

নব্বীপের পণ্ডিতসম্প্রদায়মধ্যে আর একটি প্রবাদ দীর্ঘকাল প্রচলিত আছে যে, মথুরানাথের ছাত্র ছিলেন ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ। ইহাও নিতান্ত অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হয়। উভয়ের অল্পমানদীর্ঘিটীকা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ভবানন্দ মথুরানাথের গ্রন্থ দেখেন নাই। বরং মথুরানাথ দুই এক স্থলে ভবানন্দের ব্যাখ্যা ঋণন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সঙ্গতিপ্রকরণের এক স্থলে মথুরানাথের বচনবিশেষ—যন্তু প্রত্যাসক্তিঃ অমুমিত্যাদ্বকফলসামান্যিকরণরূপেতি তদসং (মথুরীর অমুমিত্যগ্রন্থ, পরিষদের পুথি, ৫১ পত্র)—তাহাই স্মরণ করে (ভবানন্দী, সোসাইটি সং, পৃ. ১০ দৃষ্টব্য)। এতদ্বারা আমাদের পূর্বাঙ্গমানই সমর্থিত হয় যে, মথুরানাথ ভবানন্দের কক্ষিৎ পরবর্তী ছিলেন (সা-স-প, ৫০, পৃ. ১০৩)।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় (১২৭৩-১৩৪৭ সন) অধুনালুপ্ত “জ্ঞানভূমি” মাসিক পত্রিকায় “জ্ঞানদর্শন” নামে দ্বারাবাহিক কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১২৯৮ সনের চৈত্র-সংখ্যায় (পৃ. ২৪৩) তিনি মথুরানাথ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবাদ লিপিবদ্ধ করেন—তিনি “সম্ভবতঃ” শিরোমণির ছাত্র ছিলেন এবং ছাত্র কণাদের অল্পরোধে অবয়বের টীকা করেন নাই!! তখনও মথুরীর অল্পমানখণ্ড মুদ্রিত হয় নাই। মথুরানাথ অবয়বের টীকা ঠিকই করিয়াছিলেন এবং অবয়বের টীকাকার কণাদ তর্কবাগীশ মথুরানাথের ছাত্র হওয়া দূরের কথা, প্রাচীন প্রবাদ অল্পসারে তিনি স্বয়ং শিরোমণির সতীর্থ ছিলেন (সা-প-প, ৫১, পৃ. ৭০), যদিও তিনি পরে জ্ঞানকীনাথ ভট্টাচার্য চূড়ামণির ছাত্র ছিলেন। গ্রন্থাদির চুপ্রাপ্তিকালে এইরূপ কল্পিত উপাখ্যান সহজেই প্রচারিত হইয়া পড়িত। তর্করত্ন মহাশয় এ স্থলে আর একটি অশ্রুতপূর্ব প্রবাদ লিখিয়াছেন যে, মথুরানাথের নিবাগ ছিল “কোটালাপাড়, জেলা করিমপুর”। হুঃখের বিষয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেন নাই।

মধুরানাত্ নাম, তর্কবাগীশ উপাধি এবং নব্যজ্ঞানের চর্চা বঙ্গদেশের সর্বত্র এত জ্বলন্ত ছিল যে, এই ত্রিতয়ের এক ব্যক্তিতে সংযোগ বহু পণ্ডিতসমাজে সংঘটিত হইয়া নদীয়ার মুকুটমণিকে স্থানচ্যুত করার চুরাশা অর্কাচীন হৃদয়ে উত্থাপিত করিতে পারে।

মধুরানাত্‌য়ের গুরু : অল্পমানদীপ্তির পূর্ব্বদেৱ ঢাকায় ছুই স্থলে মধুরানাত্‌ "ইত্যম্‌দগুরুচরণাঃ" বলিয়া সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথমটি ব্যাখ্যিবাদে সিদ্ধান্তলক্ষণ-প্রকরণে সার্কভৌমমতধণ্ডনস্থলে (সা-প-প, ৫১, পৃ. ৭১ উদ্ধৃত ; তর্কবাগীশের জ্ঞানপরিচয়, ২য় সং, ভূমিকা পৃ. ২৪, পাদটীকা দ্রষ্টব্য—পরিষদের পুথিতে এই স্থল ত্রুটিত)। দ্বিতীয়টি বিশেষ-ব্যাখ্যি প্রকরণে—বস্তুতঃ প্রত্যক্ষমণৌ সংযোগিত্তেদস্তাপি অব্যাপ্যবাস্তবোপগমাৎ..... অত্বেদন্তেত্যা দিমূলস্তাপি কপিসংযোগিত্তেদপ্রতিযোগিত্তাবচ্ছিন্নাত্তেদন্তেত্যর্থকত্বাদিত্যম্‌দগুরু-চরণাঃ (পরিষদের পুথি, ১৪৪২—১৪৪১১ পত্র)। এই দুই স্থলেই সুবিখ্যাত জগদীশ তর্কালঙ্কারও সন্দর্ভ দুইটি অবিকল "ইত্যম্‌দগুরুচরণাঃ" বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং মধুরানাত্‌ ও জগদীশ উভয়ে একই জ্ঞানগুরু অর্থাৎ রামভদ্র সার্কভৌমের শিষ্য হইতেছেন। এই মূল্যবান তথ্য আবিষ্কারের ফলে বহু সমস্তার সমাধান হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। মধুরানাত্‌য়ের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার এক সার্কভৌমের শিষ্য ছিলেন ; এই সার্কভৌমকে পূর্ব্বে আমরা কৃষ্ণদাস সার্কভৌম বলিয়া অল্পমান করিয়াছিলাম (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১০৩)। কিন্তু তিনি রামভদ্র সার্কভৌম হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা—পিতা-পুত্রের এক গুরুর শিষ্য হওয়ার প্রবাদ তদ্বারা অংশতঃ সমর্থিত হয়। শ্রীরাম রামভদ্রের (অত্‌মদয়কাল ১৫২৫-৭৫ খ্রীঃ) প্রথম সময়ের ছাত্র হইতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা দেখা যায় না। অধিকন্তু, মধুরানাত্‌ দীপ্তির "সম্প্রদায়ে"র সহিত নিজ সম্প্রদায়ের পার্থক্য সূচনা করিয়া যে বচনাদি ধণ্ডনার্‌ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই নূতন আলোকপাতে তাহা সঙ্গত হয়। কারণ, রামভদ্রের পিতা ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি "নব্যাস্ত" পদোন্মেষে শিরোমণির এক বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রামভদ্র পদার্থধণ্ডনের ঢাকায় পিতৃমতই সমর্থন করিয়াছেন (সা-প-প, ৫১, পৃ. ৭০)। রামভদ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব পঞ্চাননও "আত্মতত্ত্বপ্রবোধ" গ্রন্থে শিরোমণির ব্যাখ্যা ধণ্ডন করিয়াছেন। যথা, "স্বাধিকরণসময়-প্রাগভাবাধিকরণক্ষণাত্মপণ্ডিতকং তথা সতি কাদাচিৎকং বা কণিকামিতি চ বৌদ্ধাধিকারব্যাখ্যানেন নব্যোক্তং ন সূক্তং..." (অম্মদীয় পুথির ১-২ পত্র)। এ স্থলেও "নব্য" পদে শিরোমণিকে বুঝাইতেছে (আত্মতত্ত্ববিবেক, সোমাইটির সং, পৃ. ২৫ দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, রাঘবদেব সার্কভৌম প্রভৃতির জ্ঞান চূড়ামণিও নব্যজ্ঞানে পুথক্‌ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শিরোমণির অপূর্ব্বে সাফল্যে সকলের চেষ্টাই বিফল হইয়া যায় এবং তাঁহাদের বংশধরগণ বাধ্য হইয়া শিরোমণির গ্রন্থ-সমূহের টীকা রচনা করিয়াই প্রতিভা প্রকাশ করেন। রামভদ্রের ছাত্র মধুরানাত্‌ দীপ্তির অনেক প্রচলিত পাঠ প্রামাদিক বলিয়া খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা একটি স্থল পূর্ব্বতন প্রবন্ধে (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১০৩) উদ্ধৃত করিয়াছি। লক্ষ্য করিতে হইবে, পাঠান্তরটি মধুরানাত্‌য়ের পিতা শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যকল্পিত বলিয়া লেখা পাওয়া গিয়াছে। এই পাঠান্তর



প্রাচীনতর রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-চক্রবর্তী ও কৃষ্ণদাস সার্কভোম মোটেই উল্লেখ করেন নাই এবং একমাত্র মথুরানাথই তাহা সমর্থন করিয়াছেন। মথুরানাথের বৈশিষ্ট্য আর একটি স্থলেও লক্ষ্যীয়। ব্যথিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাবপ্রকরণে চতুর্দশলক্ষণী মধ্যে যেটি প্রগল্ভের তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া আন্তঃ সমস্ত টীকাকার উল্লেখ করিয়াছেন, আশ্চর্যের বিষয়, মথুরানাথ একাকী তাহা “বিশারদ”-লক্ষণ বলিয়াছেন (পরিষদের পুথি, ৪৩১ পত্র)। আমাদের অমুমান, মথুরানাথের এই বৈলক্ষণ্যই তাঁহার “দীপ্তিরহস্ত” সম্যক প্রচারিত না হওয়ার অস্তুতম কারণ। পক্ষান্তরে, পরমগুরু চূড়ামণির (স্বায়মিছাস্ত-) মঞ্জরী প্রেষের উপর টীকা করিতে যাওয়া তাঁহাব পক্ষে সম্ভব হয়।

মথুরানাথের অভ্যুদয়কাল : মথুরানাথের কালনির্ণয় এখন সহজসাধ্য। তিনি তাঁহার সতীর্থ জগদীশ তর্কালঙ্কারের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ছিলেন। জগদীশ স্থানে স্থানে মথুরানাথের বচন উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, অবশ্য নামোল্লেখ করেন নাই। আমরা দুইটি স্থল উদাহরণরূপ দেখাইতেছি। ব্যাপ্তিবাদ সিদ্ধান্তলক্ষণপ্রকরণে এক স্থলে জগদীশ লিখিয়াছেন :—“যত্নু ‘দ্রব্যে ধর্ম্মিণি ভাদাভ্যোন গুণকর্ষণোঃ সাধ্যভাভ্রমং নিরসিতুমিদমিতি পক্ষনির্দেশ’ ইতি, তন্মন্দম্” (চৌখাষা সং, পৃ. ২১৩)। ইহা মাধুবীরই ব্যাখ্যা-বচন বটে (পরিষদের পুথি, ৯৮-৯ পত্র—তত্রত্য পাঠ ‘ভ্রমনিরাসায়’), কৃষ্ণদাস কিম্বা ভবানন্দের নহে। সামান্যলক্ষণপ্রকরণে শিবোমণির স্প্রসিদ্ধ অঙ্ককারলক্ষণ (‘অঙ্ককারস্ত তেজোবিশেষ-সামান্যভাবঃ’ ইত্যাদি) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জগদীশ লিখিয়াছেন—“উদ্ভূতানভিভূতরূপ-বনমহাতেজঃসামান্যভাবস্ত নার্যঃ...” (চৌখাষা সং, পৃ. ৪৬০)। ইহাও মাধুবীর বচন (২২৭২ পত্র—মহুদ্ভূতানভিভূতরূপবস্তেজঃ সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসামান্যভাব ইত্যর্থঃ), ভবানন্দাদির নহে। স্মতরাং ধরা যায়, মথুরানাথ জগদীশের প্রায় এক যুগ পূর্ববর্তী ছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থরচনাকালের অধস্তন সীমা প্রায় ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ। কারণ, জগদীশীর ১৫৩২ শকাব্দের প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হওয়ার (সা-প-প, ৫১, পৃ. ৫১) এইরূপ কাল-নির্দেশ এক্ষণে প্রামাণ্যসিদ্ধ হয়। মথুরানাথের অভ্যুদয়কালের উদ্ধৃতন সীমা হইবে প্রায় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ইহা অমুমান করা চলে যে, এই অভ্যুদয়কালের প্রথমার্ধে তাঁহার পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন। ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহু পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কৃষ্ণের বিষয়, তাহা বোধ হয় কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমরা গুণানন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধে (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৭০-১) নবদ্বীপের একটি অতীত মূল্যবান প্রাচীন বিক্রম-পত্র “উষা” পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। এই বিক্রমপত্র ১৪৯০ শকে (অর্থাৎ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) “শ্রীরামতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যাণং সদসি” সম্পাদিত হইয়াছিল। আমরা তৎকালে তাঁহাকে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র রাম তর্কালঙ্কারের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছিলাম। কিন্তু পরবর্তী গবেষণার ফলে তাহা আর সম্ভবপর হয় না। ভবানন্দের পৌত্র (উক্ত রাম তর্কালঙ্কারের পুত্র) রুদ্রদেব তর্কবাগীশ গদাধরের প্রতিদ্বন্দী ও খণ্ডনকারী ছিলেন এবং প্রায় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন (সা-প-প, ৫৫, পৃ. ৬৩-৪)। স্মতরাং

১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৮২ বৎসর পূর্বে তাঁহার পিতার সমৃদ্ধিকাল কিছুতেই ঘটে না বিশেষতঃ তৎকালে স্বয়ং ভবানন্দই নবদ্বীপের “মহাধ্যাপক”-রূপে জীবিত ছিলেন (ঐ, পৃ. ৫৭-৮) সন্দেহ নাই। অতএব এখন নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, বিক্রম-পত্রোক্ত মহাপণ্ডিত মথুরানাথের পিতা “জগদগুরু” শ্রীরাম হইতে অভিন্ন। সাধারণতঃ এ-জাতীয় বিক্রমপত্রাদি স্থানীয় সমৃদ্ধ ও প্রধান ব্যক্তির গৃহে সমবেত বহু জনসমক্ষে সম্পাদিত হইত। এ স্থলে পত্রটিতে ২১ জন সাক্ষীর স্বাক্ষর আছে এবং “সদসি” পদ দ্বারা ভট্টাচার্য্যের মহাসমৃদ্ধি সূচিত হইয়াছে। সুতরাং এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ লেখ্য হইতে প্রমাণিত হয়, ঐ সনে শ্রীরাম সমৃদ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মথুরানাথের তখন পূর্ণ যৌবন।

মথুরানাথের বংশপরিচয় :—নবদ্বীপের বৃদ্ধপরম্পরা একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, নব্যানায়ের তিন জন মহারথী মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধর যথাক্রমে রাষ্ট্রীয়, বৈদিক ও বারোহু শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে মথুরানাথের বংশ চিরলুপ্ত বলিয়া (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৯) তাঁহাদের কুলপরিচয়াদি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে।^৩ কিছু কাল পূর্বেও আমরা তাহা জানিতে পারি নাই (সা-প-প, ৫০, পৃ. ১০৪)। সৌভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি একটি কুলপঞ্জীতে তাঁহার পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের নাম আমরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। কুলপঞ্জীর পঙ্ক্তিটি যথাযথ বিবৃতি সহকারে উদ্ধৃত হইল।

“কাটাদিয়া” বন্দ্যোপাধ্যায়বংশের “ভরত” একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। কুলার্চাধ্যায়বানন্দ মিশ্রের “মহাবংশাবলী” গ্রন্থে ৭৬ সমীকরণে তাঁহার সম্বন্ধে কারিকা দৃষ্ট হয় (নগেন বস্তুর সং, পৃ. ৯০-৪)। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ “শ্রীনাথ”। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা রাম ও ব্যাস ৯১ সমীকরণের কুলীন ছিলেন (ঐ, পৃ. ১১৭)। শ্রীনাথ “বিজ্ঞানধরী” মেলের কুলীন ছিলেন, তাঁহার বংশধারা ও বিদ্বত কুলবিবরণ নানা কুলপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার ৯ পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ “যজ্ঞনন্দন” (অথবা পাঠান্তর “যজ্ঞনাথ”), তৎপুত্র “গোবিন্দরাম” যশোহর, হোগলানিবাগী জমীদার কমল রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া কুলভঙ্গ করেন (পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ১২৫১২ পত্র)। গোবিন্দরামের পুত্র “রত্ননাথ” বঙ্গালী আদি কুলীন মকরন্দের অধস্তন “বাদশ” পুরুষ এবং নিঃসন্দেহে খ্রী. ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রায় ১৬০০ সনে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার কুলবিবরণ অবিকল উদ্ধৃত হইল :—(ঐ, ঐ)

৩। গত বৎসর আমরা নবদ্বীপের একজন অভিজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলাম, নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ৮ষাছতট অর্থাৎ রায় সাহেব রামধাছ ভট্টাচার্য্যই মথুরানাথের বংশধর ছিলেন। বস্তুতঃ ষাছতটের আদিপুরুষ মথুরানাথ বিখ্যাত জ্যোতিষশ্রদ্ধকার পূর্বস্বলীনিবাদী মথুরানাথ বিজ্ঞানলঙ্কার—ইহার ঋণেই উত্থাপ্তোক্ত, পাকাতা বৈদিক। খ্রী. ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিদ্যমান এই মথুরানাথের বহু প্রামাণিক বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, তিনি নৈয়ারিক মথুরানাথ নহেন।

অন্ত বিবাহ ৮৭ শব্দর হালদারস্ত কল্পা, পশ্চাৎ মুং গৌরীকান্ত চক্রবর্তীকস্ত
কল্পাবিবাহ নদিয়াবাসী শ্রীরামতর্কালঙ্কারঃ ।

এই উক্তি হইতে কতিপয় নূতন কথা জানা যাইতেছে । পারিবারিক বিবরণের আলোচনা দ্বারা প্রতাপন হয়, নবদ্বীপনিবাসী এই শ্রীরাম তর্কালঙ্কার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে (১৫০০-৫০ খ্রী.) জীবিত ছিলেন, তিনি ভরদ্বাজপোত্র “মুখোপাধ্যায়” বংশীয় ছিলেন এবং ভঙ্গকুলীনে পোত্রেী বিবাহ দেওয়ায় বুঝা যায় সমৃদ্ধিশালী “বংশজ” ছিলেন । নবদ্বীপে একই সময়ে দুই জন স্বনামধন্য শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয় না । সুতরাং নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, ইনিই মধুরানাথের পিতা । মধুরানাথের এক ভ্রাতার নাম পাওয়া যাইতেছে “গৌরীকান্ত চক্রবর্তী,” তিনিও নিঃসন্দেহ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন । কারণ, ভৎকালে বহু স্থলে “ভট্টাচার্য্যচক্রবর্তী” উপাধিই সংক্ষেপে “চক্রবর্তী” বলিয়া খ্যাত ও লিখিত হইত—অনুমানদ্বিধিত্তির ব্যতিকরণগ্রহে “চক্রবর্তীলক্ষণ” ইহার একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ । মধুরানাথ ও তাঁহার ভ্রাতার অধস্তন বংশদ্বারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কালে যদি কোন কষ্টসহিষ্ণু গবেষক কুলপঞ্জীর নিবিড় অরণ্যে তাহা অবিকার করিয়া ক্তার্থ হন ।

উপসংহার : মধুরানাথের কোন ছাত্রের নাম অজ্ঞাবধি আবিস্কৃত হয় নাই । তাঁহার মজলাচরণল্লোকে বৃন্দাবনবিহারীর বন্দনা দেখিয়া তাঁহার প্রকৃত ধর্মমত অনুমান করা চলে না—সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ত মহিমঃস্তবেরও টীকা করিয়াছিলেন । ইহা প্রসিদ্ধ কথা এবং ইহার অনেক নিদর্শন বিস্তারিত আছে যে, নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যগণ আবহমান কাল মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন এবং তদ্বারা প্রভাবাধিত হইতেন, কিন্তু শাস্ত্রীয় যীমাংসার এবং ধর্ম্মমুঠানে চৈতন্য-প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন । মধুরানাথের কোন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক—সোসাইটি মুদ্রিত “মূলমাতারী” অনেক স্থলে বিজ্ঞানসম্মত প্রশালীতে সম্পাদিত হয় নাই । সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদনা ও মুদ্রণ বিষয়ে বাঙ্গালাদেশ অজ্ঞাত প্রদেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িতেছে, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বটপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য-বিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৬শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৫৭শ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে পরিষদের ৫৬শ বর্ষের কার্য-বিবরণ সংক্ষেপে পর্যালোচিত হইতেছে।

বাক্য : বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বাক্যব আছেন,—রাজা শ্রীনরসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সদস্য : ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা,—

বিশিষ্ট-সদস্য—১। আচার্য্য শ্রীযজ্ঞনাথ সরকার, ২। আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুনাথ ও ৫। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন-সদস্য :—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ সাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ সাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ সাহা, ৭। শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস, ৮-৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, ১০। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১১। শ্রীহরিহর শেঠ, ১২। শ্রীমেষনাদ সাহা, ১৩। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৪। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৫। শ্রীপ্রশান্ত-কুমার সিংহ, ১৬। মহারাজ কুমার ডক্টর শ্রীরত্নবীর সিংহ, ১৭। শ্রীহরিশঙ্কর বসু, ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৯। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ২০। রাও রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং ২১। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

অধ্যাপক-সদস্য :—বর্ষশেষে ৬ জন।

সহায়ক-সদস্য :—বর্ষশেষে ১১ জন।

সাধারণ-সদস্য :—বর্ষশেষে কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণসদস্যের সংখ্যা ৮৩২ জন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ : উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, চারুচন্দ্র মিত্র, ডি. আর. ভাণ্ডারকর, প্রজ্ঞানন্দরী দেবী, বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, মেধেন্দ্রলাল রায়, রসময় ধাড়া, জরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও হরিদাস ঘোষাল।

পরলোকগত সদস্য : (ক) আজীবন-সদস্য :—নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত। (খ) অধ্যাপক-সদস্য :—ভববিভূতি বিভাভূষণ। (গ) সহায়ক-সদস্য :—অনঙ্গমোহন সাহা। (ঘ) সাধারণ-সদস্য :—উপেন্দ্রমোহন রায়, কানাইলাল মণ্ডল, কৃষ্ণদাস রায় চৌধুরী, চারুচন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন নিরোগী, শৈলেশ্বর সিংহ রায় ও পূর্ণচন্দ্র সিংহ।

অধিবেশন : আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল,—(ক) পঞ্চপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন, ১৬ই পৌষ ১৩৫৬, (খ) প্রথম মাসিক অধিবেশন, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, (গ) সারকুলার বোডসহ সমাধিক্ষেত্রে কবিতর মধুসূদন দত্তের স্মৃতিপূজা, ১৪ই

আষাঢ়, (৬) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন, ২০এ শ্রাবণ, (৩) তৃতীয় মাসিক অধিবেশন ১৬ই ভাদ্র, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ২০এ আশ্বিন।

কার্য্যালয় : সভাপতি—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিবি। সহকারী সভাপতি—শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র সরকার, মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, শ্রীমুখীলকুমার দে, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীতারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীসজ্জনী-কান্ত দাস। সম্পাদক—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সহকারী সম্পাদক—শ্রীশ্রবণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবনাথ রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীঅনাথবল্লভ দত্ত। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীগণপতি সরকার। চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিত্তাহরণ চক্রবর্তী। পুঁথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীহুগোমোহন ভট্টাচার্য।

কার্য-নির্বাহক-সমিতি : নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। (ক) সদস্য-পক্ষে—১। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ২। ডাঃ শ্রীকালীকঙ্কর সেনগুপ্ত, ৩। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৪। শ্রীভগদত্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ৫। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। শ্রীদ্বিদিনাথ রায়, ৭। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৮। শ্রীপুণ্ডিনবিহারী সেন, ৯। শ্রীবল্লভকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১০। শ্রীবিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য, ১১। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১২। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীযোগেশচন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৫। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৬। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ১৯। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ২০। শ্রীমুখীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। (খ) শাখা-পরিষৎ পক্ষে—২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২২। শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী, ২৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীঅতুলচরণ দে পুরাণরত্ন।

নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত কার্য-নির্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার-সমিতিতে পরিষদের পক্ষে যে যে সদস্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা—(ক) জুবনমোহিনী দাসী স্মরণপদক-সমিতি—শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, (খ) সরোজিনী বসু পদক-সমিতি—শ্রীঅনাথবল্লভ দত্ত, (গ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা-সমিতি—শ্রীমুখীলকুমার দে।

২। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫৭শ বর্ষের কার্য-নির্বাহক-সমিতিতে ২০ জনের অধিক সভ্যপদপ্রার্থীর নাম না আসায় নির্বাচনের প্রয়োজন হয় নাই।

৩। কার্য-নির্বাহক-সমিতির ১৯এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ তারিখের অধিবেশনে স্থির হয় :—“মাসিক অধিবেশনে বখারীতি প্রস্তাবিত, সমর্থিত ও গৃহীত না হইলে কেহই পরিষদের স্থায়ী সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন না। তবে সম্পাদকের সম্মতিতে, মাসিক অধিবেশনে বখারীতি নির্বাচনের পূর্বেই টাকা দিয়া অস্থায়ী ভাবে গ্রন্থাগারের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।”

৪। মাইকেল মধুসূদনের পত্নী হেনরিয়েটার সমাধিস্থলে স্মৃতিচিহ্নগুলি পরিষৎ

খাযোগ্য সংরক্ষণ বা সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে না পারায়, মাইকেল-পৌত্র মিঃ এন. সি. ডাটন উহা নিজ ব্যয়ে সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে চাহিলে পরিষৎ সেই তার তাঁহার প্রতি অর্পণ করেন।

৫। নিম্নলিখিত সদস্তগণকে লইয়া পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধনের জন্ত এক সমিতি গঠিত হইয়াছে :—শ্রীশ্রীলকুমার দে, শ্রীজগন্নাথ পদ্মোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ও শ্রীঅনাথবল্লভ দত্ত (আহ্বানকারী।)

৬। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কয়েকটি স্থানের বানান বিষয়ে পরিষদের মতামত চাহিলে, প্রস্তাবিত সকল বানানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটির বানানে নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন :—(১) Barrackpur, (২) Palashi ও (৩) Banagram.

৭। পূর্বাচলিত ছুটির তালিকা বাতিল করিয়া অতঃপর বর্ষ মধ্যে এই উনত্রিশ দিন কার্যালয় বন্ধ রাখা স্থির হইয়াছে :—

বাংলা নববর্ষ—	১ দিন	দোলযাত্রা—	১ দিন
মহালয়া—	১ দিন	শিবরাত্রি—	১ দিন
দুর্গাপূজা—	১৫ দিন	চৈত্রসংক্রান্তি—	১ দিন
শ্রাদ্ধপূজা—	২ দিন	স্বাধীনতা দিবস—	১ দিন
বড়দিন—	১ দিন	নেতাজী জন্মদিন—	১ দিন
সরস্বতীপূজা—	২ দিন	গান্ধীজন্মদিন—	১ দিন
জন্মাষ্টমী—১ দিন।			

৮। পশ্চিমবঙ্গে অবাঙালীদের মধ্যে বিভাজনসমূহে বাংলা পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক করিবার জন্ত পরিষৎ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

সংবর্ধনা : (ক) পরিষদের প্রধান কর্মচারী ও আজীবন সেবক শ্রীরামকমল সিংহ গত ১৬ই পৌষ ১৩৫৬ তাহার অদৌর্ধ চুয়ান্নিশ বৎসর কালের কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের পরে তাঁহাকে সংবর্ধনা করিবার জন্ত এক প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন হয়। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ২৫০ টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়। আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার, ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ প্রভৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে শ্রীবৃদ্ধ সিংহের কার্যের উল্লেখ করেন। তাঁহার জায় বিশ্বস্ত এবং খাযোগ্য কর্মীর সেবার দ্বারা পরিষদের প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে। পরিষৎ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে মাসিক ৩৫ টাকার পেন্সন দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(খ) গত ৭ই মাঘ ১৩৫৬, কবি শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিসত্ততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিবার জন্ত একটি প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন হয়। সভাপতি আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়-প্রেরিত বাণী, সম্পাদক শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানপত্র, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের বক্তৃতায় এই আয়োজন সাকল্যমণ্ডিত হয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : আলোচ্য বর্ষেও বহুপঞ্চাশত্তম ভাগ পত্রিকা দুইটি মুদ্রা-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পুঁথিশালা : আলোচ্য বর্ষশেষে পুঁথির সংখ্যা ৫২০৫ খানি। ইহার মধ্যে বাক্সালা—৩২৭৬, সংস্কৃত—২৩৯৪, তিব্বতী—২৪৪, অসমীয়া—৩, উড়িয়া—৪, হিন্দী—১, ও ফার্সী—১৩।

এতদ্ব্যতীত ডঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু পরিষদের পুঁথিশালায় ১৫ খানি পুঁথি এবং অতিরিক্ত কয়েক জোড়া পুঁথির পাঠ্য দান করিয়াছেন। বহু অল্পসংখ্যক প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার ক্ষমতা পুঁথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন।

রমেশ-ভবন : ইহার সম্পূর্ণ দ্বিতলটি রেশনিং অফিসরূপে এবং নিম্ন তলের দক্ষিণ দিকস্থ বারান্দা সাহিত্য-পরিষৎ-পোষ্ট অফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্ন তলের হল-ঘরটি যথা-সম্ভব শুদ্ধাইয়া রাখা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বদান্যতা : পরিষদের "Journals" প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ৫০০০/- টাকা দান করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১২০০/- টাকার বার্ষিক সাহায্যও পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ : সাধারণ তহবিলের অর্থে (ক) রামেন্দ্র-রচনাবলীর ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ও ৫ম খণ্ডের মুদ্রণও প্রায় শেষ হইয়াছে। (খ) শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'পরিষৎ-পরিচয়' এবং 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্ভুক্ত ৭৬-৮২ সংখ্যক পুস্তক (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; চণ্ডীচরণ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু; নন্দকুমার ছায়চুড়ু ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন; রজনীকান্ত সেন; হারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়; হরিশাধন মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়; চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়), (গ) ২য় খণ্ড 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, এবং (ঘ) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র একটি অভিনব সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে বিহারিলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল'; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' এবং 'শুভ বিবাহ'-রচয়িত্রী শরৎকুমারী চৌধুরাণীর সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ', 'বর্ষভঙ্গু' ও 'শ্রীমন্তগবদগীতা'; দীনবন্ধু মিত্রের 'আমাই বারিক' ও 'বিয়েপাগলা বুড়ো,' মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' এবং ভারতচন্দ্র রায়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে রিকার্ডের 'ধনবিজ্ঞান'এর মুদ্রণ চলিতেছে। ইহার অনুবাদক শ্রীমুখা কান্ত রায়চৌধুরী।

গ্রন্থাগার : আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৩০০ খানি পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা (জ্ঞানী—১৩৩, উপহারপ্রাপ্ত—২৭৮) সংযোজিত হইয়াছে। সংগৃহীত গ্রন্থগুলির মধ্যে ১। কৃষ্ণকান্তের উইল (১ম সং ১৮৭৮), ভারত মহিলা (১ম সং), ভারত হিন্দু সভার

সভাপতির অভিভাষণ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) উল্লেখযোগ্য। পরিষদগ্ৰন্থাবলী ও পত্রিকার বিনিময়েও উপহারস্বরূপ বহু পুস্তক পত্রিকা পাওয়া গিয়াছে।

পরিষদগ্ৰন্থাগারের পুস্তক-তালিকা সঙ্কলনের কার্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বদান্ততায় এই কার্য শীঘ্রই সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।

আলোচ্য বর্ষেও অল্পসঙ্খিৎসু পাঠককে পরিষদগ্ৰন্থাগারের চুস্ত্রীপ্য গ্ৰন্থ ও সাময়িক-পত্র আলোচনা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান : পূর্ববৎ এবারও কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষৎ-মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন; পরিষৎ এ ক্ষত বিশেষ কৃতজ্ঞ। সুখের বিষয়, এই বৎসর তাঁহার (পরিষদগ্ৰন্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় বাবদ) যে ছই বারের (১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮) সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ১৯৪৬-৪৭ বাবদ মাত্র ৫০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আশা দিয়াছেন যে, বাকী টাকা তাঁহার শীঘ্রই মিটাইয়া দিবেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার : আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার হইতে কবি করুণানিশানকে প্রদত্ত টাকার তোড়ার অল্প ২৫০ টাকা এবং কবি শ্রীশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্যকে বার্ষিক্য ও অন্তঃস্থতার অল্প সাহায্য বাবদ ১৫০ দেওয়া হইয়াছে। ময়মনসিংহের সাহিত্যিক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এককালীন ২৫ সাহায্য লাভ করিয়াছেন।

বঙ্কিম-ভবন : পরিষদের নৈহাটি শাখার উদ্ভাবনানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে। এই স্থানে বঙ্কিমের জন্মশতবার্ষিক উৎসব প্রভৃতি ষথারীতি অমুষ্ঠিত হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ : আলোচ্য বর্ষে পুনা (বোম্বাই) ও কাটিহার (বিহার) হইতে শাখা-পরিষৎ স্থাপন করিবার ক্ষমত আবেদন আসিয়াছিল। উভয় প্রতিষ্ঠানকে শাখা-পরিষৎ স্থাপন করিতে অম্মতি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে কেবল মাত্র কাটিহারে শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে—এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কাটিহারে সম্পাদক-পদে শ্রীমুখীন দাসগুপ্ত অধিষ্ঠিত আছেন।

নিয়মাবলীর পরিবর্তন : কার্য-নির্বাহক-সমিতি মূল নিয়মাবলীর ১৪ ধারার প্রথমংশ ও ৭০ ধারা এইরূপ পরিবর্তন করিয়াছেন :—

“১৪। যে-কোন বাঙ্গালা সাহিত্যসুহৃদ ব্যক্তি বা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান (একজন প্রতিনিধি মারফৎ) পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

৭০। কার্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দিষ্ট ব্যবস্থাসমুহারে কোষাধ্যক্ষ সম্পাদকের সহিত, ~~এ~~ প্রয়োজন ঘটিলে কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও অপর একজন কর্মধ্যক্ষ, এই তিন জনের যে-কোন ছই জন—সকল তহবিলের টাকার আদান প্রদান করিতে পারিবেন।”

৯২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষটপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য-বিবরণ

এই পরিবর্তিত নিয়মাবলী যথারীতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭ তারিখের সাধারণ সভায় গৃহীত হইয়াছে।

রামপ্রাণ শুক্ল-পুরস্কার : ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায় গত ১৬ই পৌষ ১৩৫৬ তারিখে “প্রাচীন বাঙ্গালীর ইতিহাসের ইঙ্গিত” বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তা পুরস্কারের অর্থ নিজে গ্রহণ না করিয়া পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।

কলিকাতার মেসার্স বি. এন. মুখার্জি এন্ড কোং ও শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু (চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্) পরিষদের সমুদয় হিসাব-পত্র যথারীতি পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

উপসংহার : পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আমরা নানা ভাবে কর্ম্ম ও সদস্যদের সহায়তায় পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের প্রসার ও উন্নতি সাধন করিতে পারিলেও অর্থাভাবে সকলের সকল অসুবিধা দূর করিতে পারি নাই। পরিষৎ-মন্দিরের সংস্কার ব্যাপারে যে আর্থিক ব্যয়ের আমরা সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার অথবা পূর্বকালের মত কোন বদাশ্র ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া আমরা মিটাইতে পারিব না। মন্দির-সংস্কার এবং বৈজ্ঞানিক তার আমূল পরিবর্তিত না হইলে গবেষণাপ্রয়াসী সদস্যদের যথোপযুক্ত অসুবিধা দিতেও আমরা পারিতেছি না—অনেকে অনেক অসুবিধার মধ্যে তথাপি কাজ চালাইয়া যাইতেছেন, পরিষদের এই লজ্জা অচিরে দূর করা আবশ্যক। কলিকাতা পৌর-সভা বার্ষিক নিয়মিত সাহায্য রহিত করিয়া নূতন নূতন পুস্তক-সংগ্রহের অ্রযোগ হইতে পরিষৎকে বঞ্চিত করিয়াছেন। যদি এককালীন সাহায্য আমরা সংগ্রহ করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রত্যেক সদস্যকে তৎপর হইয়া নূতন সদস্যবৃদ্ধি দ্বারা অর্থাগমের পথ লুপ্ত করিতে হইবে। তাঁহাদের সাহায্য পাইলে আমরা বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকেও আপনার পায়ে দাঁড়াইতে পারিব, এবং নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা ও আলোচনা-সভা আহ্বান করিয়া সকলের সহিত যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করিতে পারিব। কলে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রও বিস্তৃততর হইবে। আমার নিবেদন তাই আজ প্রধানতঃ সদস্যদের নিকট। সকলের সক্রিয় সাহায্যই আমাদের প্রার্থনীয়। দূরে থাকিয়া শুধু বার্ষিক টাকা দিয়াই আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, পরিষৎ-মন্দিরে নিয়মিত হাজিরা দিয়া ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে এই পরিষৎই আবার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মাধ্যমে সকল বাঙ্গালীর মিলনক্ষেত্র হইবে—সাহিত্য-পরিষৎ যথার্থ সার্থকতা লাভ করিবে।

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯ অগ্রহায়ণ ১৩৫৭।

সম্পাদক

কার্য-নির্বাহক-সমিতির পক্ষে।